বিশ্বাসহীনতার দুঃস্বপ্ন

মূল ঃ হারুন ইয়াহিয়া
অনুবাদ ঃ খোন্দকার রোকনুজ্জামান

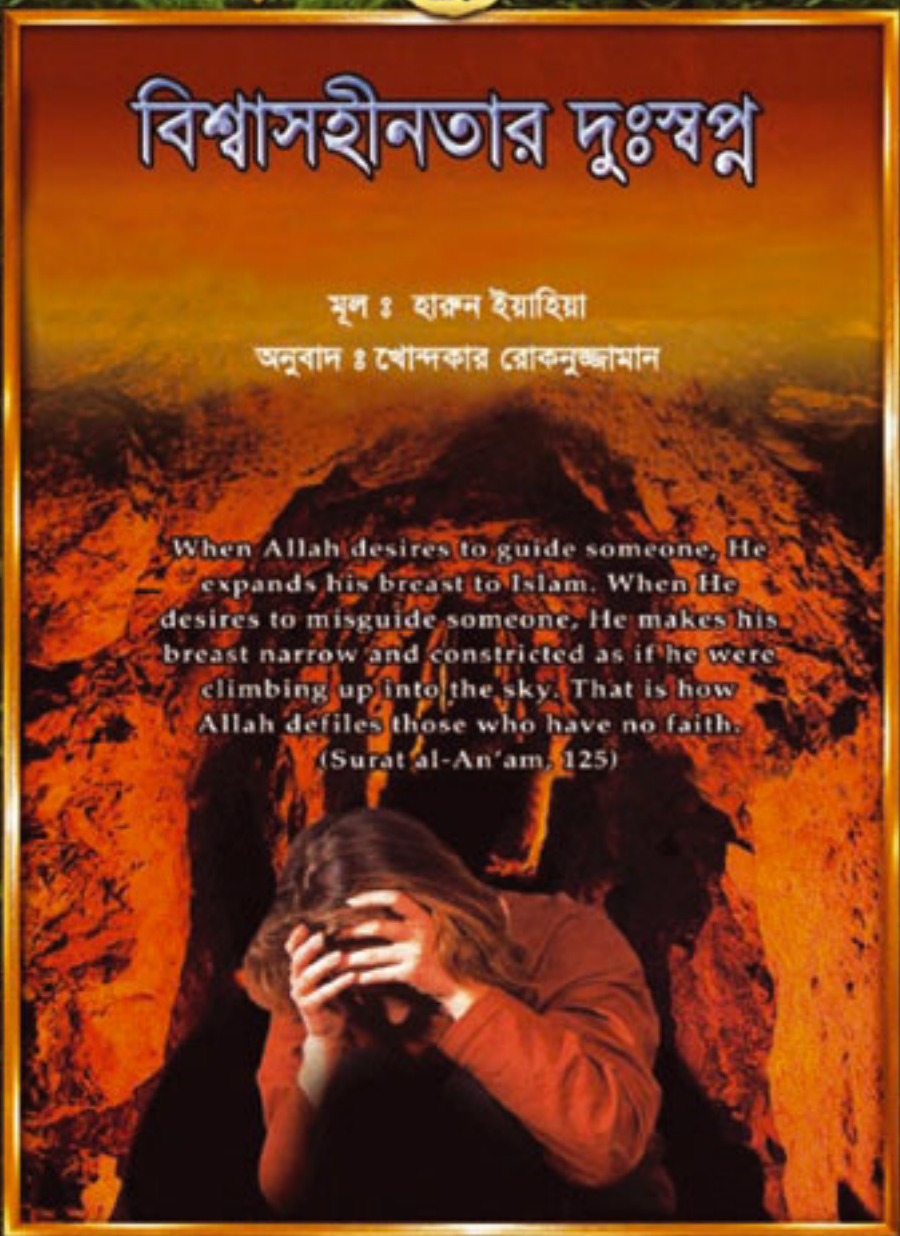

বিশ্বাসহীনতার দুঃস্বপ্ন

মূলঃ হারুন ইয়াহিয়া
অনুবাদঃ খোন্দকার রোকনুজ্জামান

অনলাইন সংস্করণঃ
www.harunyahya.com

নিবেদিতঃ

পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরু

জনাব এ, কে, এম, মহিউদ্দীন

প্রফেসর (অবঃ), ইংরেজি বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

সত্যধর্ম কি? ১

ধর্ম কেন অবতীর্ণ হল? ৭

সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রভাব ২২

মানবদেহের উপরে বিশ্বাসহীনতার নেতিবাচক প্রভাব ৬৬

ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুসরণে সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান ৭৫

সমাধান রয়েছে আল কুরআনের মূল্যবোধে ৯৬

ডারউইনবাদের পতন ৯৯

বিশ্বাসহীনতার দুঃস্বপ্ন

লেখক পরিচিতিঃ হারুন ইয়াহিয়ার জন্ম ১৯৫৬ সালে তুরস্কের আঙ্কারায়। তাঁর প্রকৃত নাম আদনান ওকতার। তবে ছদ্মনামেই তিনি চিন্তাশীল মানুষের জগতে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। ইতোমধ্যে তিনি অসংখ্য সাড়া জাগানো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর চরিত গ্রন্থগুলি ইংরেজি, বাংলা, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালীয়, পর্তুগীজ, উর্দু, আরবি, আলবেনীয়, রুশ, বসনীয়, উইঘুর এবং ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। হারুন ইয়াহিয়া মূলতঃ বিশ্বাসহীনতার অন্তঃসারশূন্যতা, স্রষ্টার অস্তিত্ব, পারলৌকিক জীবনের প্রমান, জড়জগত এবং জীবজগতের সৃষ্টিরহস্য, বিবর্তনবাদের অসারতা এবং মানবসমাজের উপর এই মতবাদের ধ্বংসাত্বক প্রভাব, বিশ্বাসবিবর্জিত জাতিসমূহের করুণ পরিণতি, কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিস্ময় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁর লেখনী চালিয়েছেন। তাঁর লেখা ক্ষুরধার যুক্তি এবং বিপুল তথ্য, উপাত্ত এবং উদ্ধৃতিতে ঋদ্ধ। তাঁর ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার রহস্য এখানেই। হারুন ইয়াহিয়ার রচনা বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মানুষকে ভ্রান্ত মতবাদের গোলকধাঁধাঁ থেকে বের করে এনেছে এবং আনছে।

সত্যধর্ম কী?

আমি কোথা থেকে এলাম ? কোথায় যাবো? আমার জীবনের অর্থ এবং লক্ষ্য কী? মৃত্যু কেমন? মৃত্যুর পরে জীবন আছে– এটা কি নিশ্চিত? বেহেস্ত-দোজখের অস্তিত্ব আছে কি? প্রাণের উৎস কী? আমাদের স্রষ্টা কোথায়? আমাদের নিকট স্রষ্টার দাবী কি? আমি কিভাবে সঠিক এবং বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করবো? এসব প্রশ্নের উত্তর আমি কোথায় খুঁজে পাবো? . . .

যুগে যুগে মানুষ এসব গূঢ় প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছে, গুরুত্ব সহকারে এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছে। তবে সাধারণভাবে যা বিশ্বাস করা হয়, তা এখানে সঠিক প্রমাণিত হয়নি। অর্থাৎ এসব প্রশ্নে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উত্তর সকল যুগে পাওয়া গেছে স্রষ্টার অবতীর্ণ "সত্যধর্ম" থেকে , দার্শনিকদের নিকট থেকে নয়।

অনেক ধর্মই বিশ্বব্যপী অনুসারীদেরকে আকৃষ্ট করে এসেছে– বৌদ্ধধর্ম, শামানিজম ও পৌত্তলিকতা হল এরূপ কয়েকটি ধর্ম। তবে এগুলোর কোনটাই স্রষ্টার অবতীর্ণ নয়। অতএব, এগুলো দর্শন বা আন্দোলন ছাড়া আর কিছু নয়। এগুলোর কোন কোনটার কেবল প্রতীকী এবং সাংস্কৃতিক অর্থ রয়েছে; এরা কোন সমস্যার সামাজিক বা মনস্তাত্বিক সমাধান প্রদান করে না। যারা এসব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরাও এসব গূঢ় প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেছেন, তবুও তারা কখনো নির্ভরযোগ্য জবাব খুঁজে পাননি।

তবে কিছু "সত্যনিষ্ঠ ধর্ম" রয়েছে যেগুলিকে এসব মিথ্যা ধর্ম থেকে পৃথকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। সত্যনিষ্ঠ ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা সেগুলিকে মিথ্যাধর্ম থেকে পৃথক করে, তা হল তাদের উৎসঃ তাদের মূলে রয়েছে ঐশী প্রত্যাদেশ। আল্লাহ মানুষকে আল কুরআনের মাধ্যমে অন্যসব ধর্ম, দর্শন ও সামাজিক ব্যবস্থার উপরে সত্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত করছেনঃ

“তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন দিকনির্দেশনা এবং সত্যধর্ম সহকারে, যেন এটা অন্যসব ধর্মের উপরে বিজযী হয়; স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।” (সূরা আল ফাতহ্ঃ ২৮)

“তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন এটাকে সব ধর্মের উপরে প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।”(সূরা আস সফঃ ৯)

ইহুদিধর্ম, খৃষ্টানধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মূলে রয়েছে আল্লাহ্‌র ওহী বা প্রত্যাদেশ। উৎসের দিক থেকে এগুলি সব আল্লাহকর্তৃক অবতীর্ণ। তবে ইহুদীধর্ম ও খৃষ্টানধর্ম নিজ নিজ রাসূলের পরবর্তী যুগে বিকৃতির শিকার হয়েছে।

বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে মানুষ অসংখ্য বিকৃতি ঘটিয়েছে, সংযোজন-বিয়োজন করেছে। কালস্রোতে যখন মূল গ্রন্থ হারিয়ে গেছে, তখন নানা প্রকার জাল পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম আবির্ভূত হয়েছে। ইতোমধ্যে মূলগ্রন্থকে মানুষ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। অতএব, এসব ধর্মে অনুসারীরা প্রকৃত প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং তাদের বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা এবং জীবনযাত্রাকে স্থাপন করেছে ধর্মের সম্পূর্ণ বিকৃত উপলব্ধির উপরে যা তাদের ধর্মনেতারা উদ্ভাবন করেছে। অদ্যাবধি এসব বিশ্বাস এবং ব্যাখ্যা টিকে রয়েছে। এভাবে, এসব বিকৃত ধর্ম উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে পড়েছে।

এসব ধর্মের বিকৃতির পরে, আল্লাহ তাঁর শেষ জান্নাতী প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন; এটা চিরকাল অপরিবর্তিত থাকবে। তিনি স্বয়ং এটিকে সকল প্রকার বিকৃতি হতে রক্ষা করবেনঃ

“নিশ্চয় আমি যিকর (স্মারক গ্রন্থ– আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এটার রক্ষক।” (সূরা আল হিজরঃ ৯)

১৪ শতাব্দী ব্যপী আল কুরআন অপরিবর্তিত রয়েছে এবং বিকৃতি থেকে মুক্ত রয়েছে। আজ আমাদের নিকট যে কুরআন রয়েছে, তার সঙ্গে হস্তলিখিত আদি কুরআনের বর্ণে বর্ণে সাদৃশ্য রয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণে মানুষ সম্পূর্ণ অভিন্ন কুরআন পাঠ করে থাকে; এটাই প্রমান করে যে, আল কুরআনকে আল্লাহ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করছেন।

চিরকাল আল্লাহ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন হয় তাঁর রাসূলগণের সাহায্যে, নয়ত তাঁর পবিত্র গ্রন্থের সাহায্যে। পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রথম মানব নবী আদম (আঃ)-কে আল্লাহ একই দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। অন্য কথায়, প্রথম যে সকল মানুষ পৃথিবীপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এর পরে, মানবেতিহাসব্যাপী অনেক নবী-রাসূল এবং পবিত্র গ্রন্থ এসেছিল। এই সত্যটি কুরআনে উল্লেখিত হয়েছেঃ

“মানুষ ছিল একক সম্প্রদায় অতঃপর আল্লাহ পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয় মীমাংসা করতে পারেন। . .” (সূরা বাকারাঃ ২১৩)

উপরোক্ত আয়াতে গুরুত্বসহকারে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁর নবী-রাসূল এবং পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে। নবী-রাসূলগণ সর্বদা তাঁর জাতির লোকদেরকে শেষ বিচারের দিন এবং দোজখের অনন্ত শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতেন; অনন্ত সুখের আবাস জান্নাতের সুসংবাদও তাঁরা দিতেন। আল্লাহ, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কেবল জানেন ঠিক কোন্ অবস্থায় মানুষ এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সচ্ছন্দ বোধ করবে। এজন্যই আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দার নিকট সেই জীবন-প্রণালী এবং নৈতিকতা দাবী করেন যা এই পৃথিবী এবং পরজীবনে শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ প্রদান করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আল্লাহ্‌র কৃপায়, ধর্ম হল সেই পদ্ধতি যা মনস্তাত্বিক ও সামাজিকভাবে আদর্শ জীবন-কাঠামো গড়ে তুলতে মানুষকে সাহায্য করে ।

যদিও কোন বিশেষ সময়কালের পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিবেচনায় বিভিন্ন নির্দেশনা অবতীর্ণ হয়েছে, তবুও অবতীর্ণ ধর্মগুলি মূলতঃ অভিন্ন বিশ্বাস ও নৈতিকতার দৃষ্টান্ত

পেশ করে। সকল অবতীর্ণ ধর্ম আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে মৌলিক সত্যাবলী পেশ করে। তারা আল্লাহ্‌র গুণাবলী ব্যাখ্যা করে, মানুষ এবং অন্যান্য জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে, কিভাবে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা হওয়া যায় তা অবগত করে, আল্লাহ্‌র প্রশংসিত আদর্শ মনোভঙ্গী ও আচরণ সম্পর্কে ধারণা দেয়, সঠিক ও বেঠিক, ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়, কিভাবে জীবন যাপন করলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করা যায়, তা ব্যাখ্যা করে।

এই অবস্থান থেকে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রকৃত সত্যধর্ম হল ইসলাম। নবী আদম (আঃ)-এর সময়কাল থেকে মানুষের প্রতি অবতীর্ণ সকল ধর্মের ভিত্তি হল ইসলাম, যার অর্থ হল "আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পন"। এই বাস্তবতা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ "নিশ্চয় ইসলাম হল আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র ধর্ম।" (সূরা আল ইমরানঃ ১৯)

সত্যনিষ্ঠ ধর্মগুলি নিজ নিজ রাসূলের ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হয়; তদনুসারে এগুলিকে "ইহুদী ধর্ম" এবং "খৃষ্টান ধর্ম" বলা হয়। তবে এই রাসূলদের আনীত ধর্ম ছিল একই সত্যনিষ্ঠ ধর্ম। অন্য কথায়, তাঁদের সময়ে এগুলিও ছিল ইসলামঃ

". . তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপরে কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও. ." (সূরা আল হাজ্জঃ ৭৮)

কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে যারা আল্লাহ্‌র কিতাব লাভ করেছে (ইহুদী ও খৃষ্টান), তারা আসলে মুসলিম ছিল। এই সত্যটি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাদের বরাত দিয়ে, যারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে সত্যপন্থী ছিলঃ

"কুরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য । আমরা বহু পূর্ব থেকেই মুসলিম ছিলাম।" (সূরা আল ক্বাসাসঃ ৫২-৫৩)

আল্লাহ্ ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত করতে এই বিষয়ে কুরআনে ঘোষণা করছেনঃ

“ইবরাহীম না ইহুদী ছিলেন, আর না খৃষ্টান। বরং তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তিনি মূর্তিপূজকদের দলভূক্ত ছিলেন না।” (সূরা আল ইমরানঃ ৬৭)

আল কুরআনে আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে, সকল যুগে সকল নবী একই রকম উপাসনা ও বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আল কুরআনে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

জাকারিয়া নবী (আঃ) সম্পর্কে বলা হচ্ছে, ফেরেশতা যখন তাঁকে আহ্বান করলেন “তখন তিনি নামাজে দণ্ডায়মান ছিলেন”। (সূরা আল ইমরানঃ ৩৯)

শুআইব (আঃ) সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে এই বলে আহ্বান করলোঃ “হে শুআইব, আপনার নামাজ কি আপনাকে এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদের পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? নাকি আমাদের ধন-সম্পদ ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খুব মহৎ ব্যক্তি এবং সৎপথের পথিক।” (সূরা আল হুদঃ ৮৭)

হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, “তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামাজ ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।” (সূরা মারয়ামঃ ৫৫)

হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করছেনঃ “আমি তাঁদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাজিল করলাম সৎকর্ম করার, নামাজ কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার। তাঁরা আমার ইবাদাতে ব্যাপৃত ছিলেন।” (সূরা আল আম্বিয়াঃ ৭৩)

হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর ভাইকে আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেনঃ “. . তোমাদের ঘরগুলি বানাবে ইবাদাতখানা এবং নামাজ কায়েম করবে . . ” (সূরা ইউনূসঃ ৮৭)

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ "আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে।" (সূরা মারয়ামঃ ৩১)

হযরত লুকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে লক্ষ্য করে এভাবে উপদেশ দিচ্ছেনঃ "হে আমার পুত্র, নামাজে অবিচল থাকো এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করো।" (সূরা লুকমানঃ ১৭) এবং " হে পুত্র, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করো না। কারণ, মূর্তিপূজা এক ভয়ানক পাপ।" (সূরা লুকমানঃ ১৩)

হযরত মারয়াম (আঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, "হে মারয়াম, তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর।" (সূরা আল ইমরানঃ ৪৩)

উপাসনা এবং বিশ্বাসের মূলনীতি ও পন্থা সম্পর্কে এ হল অল্প কিছু উদাহরণ; এগুলির আরো বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব। কারণ, সকল নবী-রাসূলের উপর একই সত্যনিষ্ঠ ধর্ম অবতীর্ণ হয়েছে। এই সত্যনিষ্ঠ ধর্মের মৌলিক এবং অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচিত হয়েছে নিম্নলিখিত আয়াতেঃ

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। এটাই সঠিক ধর্ম।" (সূরা আল বাইয়িনাহ্‌ঃ ৫)

ফলতঃ আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। এই অবিসংবাদিত সত্য কুরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করলে তা কখনোই গ্রহন করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আল ইমরানঃ ৮৫)

ধর্ম কেন অবতীর্ণ হলো?

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে প্রত্যেকে এই যোগ্যতা দ্বারা ভূষিত যে, সে আপন বিবেক ও জ্ঞান প্রয়োগ করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অনুধাবন করবে।

এটি এক স্পষ্ট বাস্তবতা যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু থেকে নিয়ে মহাবিশ্বের সকল কিছু আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আমাদেরকে বষ্টেনকারী সকল কিছু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জোরালো প্রমান। আল্লাহ্‌ পরিপূর্ণতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন আকাশের উড়ন্ত পক্ষীকূল, সাগর-মহাসাগরে বিচরণকারী মৎস্য, মরুর উষ্ট্র এবং মেরুর পেঙ্গুইন; আমাদের দেহের মধ্যস্থ ব্যাকটেরিয়া যা খালি চোখে দেখা যায় না, ফল-মূল, বৃক্ষ-লতা, মেঘমালা, গ্রহ-উপগ্রহ এবং সুবিশাল ছায়াপথ। তিনি তাদেরকে প্রত্যেককে সজ্জিত করেছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্গ-তন্ত্র এবং উন্নত বৈশিষ্ট্য সহকারে।

অনুরূপভাবে, পৃথিবীর বুকে জীবের প্রাণ ধারণের জন্য যে ব্যবস্থাপনা, তা খুবই সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপরে ভিত্তিশীল। এসব ভারসাম্যের অতি সামান্য, এমনকি মিলিমিটার পর্যায়ের পার্থক্য বা বিচ্যুতি ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব করে তুলবে। এসব ভারসাম্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষণ থেকে এর অন্তর্নিহিত অসাধারণ হিসাব ও পরিকল্পনা স্পষ্ট ধরা পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, পৃথিবী যদি কিছুটা ধীর গতিতে সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হতো, তাহলে দিন ও রাত্রের তাপমাত্রায় বিপুল পার্থক্য ঘটতো। পক্ষান্তরে, গতি দ্রুততর হলে, ঘুর্ণিঝড় ও বন্যার আধিক্যে প্রাণের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়তো।

তেমনিভাবে, এমন অনেক সূক্ষ্ম ভারসাম্য রয়েছে যা এই পৃথিবীকে জীবন ধারণের অনুকূল গ্রহে পরিণত করেছে। এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, তারা আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তদনুসারে, এটা অসম্ভব যে, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট ভারসাম্য এবং হিসাব-নিকাশকে অন্ধ আকস্মিকতা ফল মনে করবে। একটি গাড়ি বা

একটি ক্যামেরা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় একজন সচেতন পরিকল্পনাকারীর কথা। তেমনিভাবে, একজনের এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে, মহাবিশ্ব, তার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থাপনার অসাধরণ নেটওয়ার্ক সহকারে, নিজে থেকে নিয়ন্ত্রিত হবার মত সত্ত্বা নয় যা স্বয়ং অস্তিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সৃষ্টির প্রমাণের দিকেঃ

"তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর। এই পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেনফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধারে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয় এতে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যেসব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলিতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা আন নাহলঃ ১০-১৩)

"তবে কি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তার মত যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" (সূরা নাহলঃ ১৭)

আপন স্রষ্টাকে চেনার জন্য উল্লেখিত আয়াতগুলিতে যেসববিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করটাই যথেষ্ট। ধর্মীয় জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও একজন ব্যক্তি যদি এসবনিয়ে অনুধ্যান করে, তবে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে এবং তাঁর ক্ষমতা ও শক্তি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত জটিল অঙ্গ-তন্ত্রের দ্বারা গঠিত নিজের দেহের কথা বিবেচনা করলেই যে কেউ আল্লাহর চমৎকার সৃষ্টির ব্যপারে সচেতন হবে।

ফলতঃ কেউ যদি আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ গন্থের ব্যাপারে সচেতন না-ও থাকে, তবুও সে আল্লাহ্‌কে চিনতে পারে পারিপার্শ্বিকতার প্রত্যক্ষণ ও চিন্তনের সাহায্যে । সমঝদার লোকের জন্য পৃথিবী হল প্রমানের মহাসমুদ্র।

“নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্এক স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে) পরওয়ারদেগার, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই; তুমি আমাদেরকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো।”(সূরা আল ইমরানঃ ১৯০-১৯১)

এই পর্যায়ে এসে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা কেবল এই কারণে যে, কেউ যখন তার স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, তখন সে অবশ্যই তাঁর সান্নিধ্য পেতে চায়, তাঁকে আরো ভালভাবে জানতে চায়, তাঁর ভালবাসা এবং করুণা লাভের উপায় জানতে চায়। এটা করার একমাত্র উপায় হলো কুরআনের শিক্ষা ভালমত অনুধাবন করা; আর কুরআন হল আল্লাহ্র অবিকৃত বাণী এবং সত্যধর্ম ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ।

আল কুরআন শিক্ষা দেয় সবচেয়ে মৌলিক বিষয়গুলি যা মানুষের জানা প্রয়োজনঃ প্রতিটি যুগে আল্লাহ বার্তাবাহক এবং পবিত্র গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন মানুষের জন্য। এভাবে তিনি মানুষের নিকট নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন; মানুষকে জানিয়েছেন তাঁর মনোনীত আচরণ, মনোভঙ্গী, নৈতিক মূল্যবোধ এবং জীবনপ্রনালীর কথা। নবী-রাসূলগণ মানুষকে জানিয়েছেন ভাল-মন্দ, সঠিক-বেঠিকের সত্যিকার ধারণা সম্পর্কে; মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করেছেন; আল্লাহ্র নির্দেশ মান্যকারীদের পুরস্কার এবং অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কে অবগত করেছেন।

এইভাবে আল্লাহ্ অবতীর্ণ ধর্মের মাধ্যমে এমন প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন যা মানুষের জীবনব্যাপী জানা প্রয়োজন। এই জগত এবং পরলোকের জীবনের পূর্ণতা এবং সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। সত্যাশ্রয়ী ধর্মের এই মূল উদ্দেশ্য মানুষকে অবহিত করা হয়েছে নবী-রাসূল এবং ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে। বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ

“আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।” (সূরা আন নাহলঃ ৮৯)

“আমি এটি (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি সত্য সহকারে এবং সত্য সহকারেই এটি অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি মানুষকে সুসংবাদ দিতে এবং সতর্ক করতে।” (সূরা আল ইসরাঃ ১০৫)

“অতঃপর আমি মুসাকে দিয়াছিলাম কিতাব যা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য সম্পূর্ণ , যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ– যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। ” (সূরা আল আনআমঃ ১৫৪)

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল কুরআন ব্যাখ্যা করেঃ বিশ্ব ইতিহাসব্যাপী হাজারো কোটি মানুষ জন্মগ্রহন করেছে, জীবন ধারণ করেছে, শেষে মৃত্যুবরণ করেছে। এদের মধ্যে অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে। বাকিরা স্রেফ দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহে ভেসে চলেছে এবং মরীচিকার পিছনে ছুটে জীবন অতিবাহিত করেছে। মূলতঃ আপন আকাঙ্খা পূরণ করাই তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। প্রায় সকল সমাজে যুগে যুগে এই প্রকার আচরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অসচেতন এবং দায়িত্বহীন দৃষ্টিভঙ্গী । সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রতিটি প্রজন্ম পূর্ববর্তীদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে এবং স্রেফ পূর্বপুরুষের জীবনের লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে। এটা এক অশুভচক্র যার পুনরাবৃত্তি আজও ঘটে চলেছে।

অধিকাংশ লোক এক “অভিন্ন” দর্শন ও নীতির দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। এই দর্শনের ভিত্তি হল এই যুক্তি যে, মানুষ জন্ম লাভ করে, যৌবন প্রাপ্ত হয়, বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং মৃত্যু বরণ করে; জন্ম একবারই এবং মৃত্যু সবকিছুর সমাপ্তি ঘটায়। এই কারণে মানুষকে যতটা সম্ভব জীবনকে উপভোগ করতে হবে এবং আজীবন চেষ্টা করে যেতে হবে আপন ইচ্ছা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য।

এভাবে পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে প্রাপ্ত জীবনধারা এবং আচরণবিধি মেনে চলার মাধ্যমে মানুষ তার জীবনটা ব্যয় করে। এই জীবন-কালকে তারা তাদের একমাত্র সুযোগ মনে করে । মৃত্যুচিন্তা থেকে একেবারে মুক্ত থেকে তারা আনন্দ-উল্লাসের পিছনে ছোটে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করাকে তারা জীবনের পরম লক্ষ্য জ্ঞান করে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পার্থক্য সত্ত্বেও এই ব্যাপারটা সকল জাতির মানুষের ক্ষেত্রেই সত্য। সম্মানজনক শিক্ষা, ব্যবসায় জীবনে প্রশংসনীয় অবস্থান, উচ্চ জীবন-মান, সুখী পরিবার এবং এরূপ অসংখ্য লক্ষ্য জীবনের অপরিবর্তনীয় আকাঙ্খায় পরিণত হয়।

এসব লক্ষ্য নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে এবং এই আলোচনা অনেক পৃষ্ঠা দখল করতে পারে। যাহোক, বাস্তবতা হল, এসকল লোক তাদের অস্তিত্বের এক এবং একমাত্র কারণ উপেক্ষা করে থাকে। ইতোমধ্যে তারা সারাটা জীবন অতিবাহিত করে বৃথাই। অথচ জীবনটা হল চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রদত্ত এক অনন্য সুযোগ । এই চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা। কুরআনে এটা বর্ণিত হয়েছে এভাবেঃ"আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার দাসত্ব করার জন্য।" (সূরা আয যারিয়াতঃ ৫৬)

আল্লাহ্‌র উত্তম গোলাম হবার পন্থা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র গোলাম হবার অর্থ হল তাঁর অস্তিত্ব এবং একত্ব স্বীকার করে নেওয়া; তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জানা এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া; তিনি ভিন্ন অন্য কোন সত্তার উপাসনা না করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আত্মনিবেদন করা। আল কুরআনে আল্লঅহ্‌র পছন্দনীয় নৈতিক মূল্যবোধ এবং জীবনশৈলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এবং মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে এই জীবনধারার প্রতি।

যে ব্যক্তি এসব মূল্যবোধের সীমার মধ্যে জীবন যাপন করে, তাকে এই জগতে এবং পরজগতে বিশুদ্ধ জীবনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে । তা না করলে তার জন্য অপেক্ষা করছে এক তিক্ত পরিণতি।

এই পৃথিবীতে একজন যে জীবনধারা অনুসরণ করে, তা-ই তার চিরকালীন জীবন-কাঠামো গড়ে দেয়। মৃত্যুর পরে মন্দকর্মের ক্ষতিপূরণের কোন সুযোগ নেই। অতএব, এভাবে আচরণ করা যেন মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে তার অস্তিত্বের জন্য আকস্মিকতার নিকট ঋণী, যেন সে কোন সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ নয়, যেন সে এই পৃথিবীতে এসেছে বৃথা আকাঙ্খার পিছনে ছুটে জীবন কাটানোর জন্য – এরূপ আচরণ পরিণামে তার নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে। যারা নিজের অস্তিত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবজ্ঞা ক'রে আপন স্রষ্টার প্রতি দায়িত্বহীন আচরণ করে, এবং পরজীবনে এর পরিণতি সম্পর্কে নির্বিকার থাকে, তাদেরকে পরলোকে এভাবে তিরস্কার করা হবেঃ "তোমরা কি ধারণা করেছিলে, তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমাদেরকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে না?" (সূরা মু'মিনূনঃ ১১৫)

বাস্তবে, এরকম লোক জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অসচেতন নয়। আল্লাহ্ তাঁর নবী-রাসূল এবং পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে এটা ঘোষণা করেছেন এবং সত্যের পথে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তছাড়া, সতর্ক হবার জন্য মানুষকে সারাটা জীবন অবকাশ প্রদান করা হয়েছে। যারা এসব সুযোগের প্রতি কর্ণপাত না করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হয়েছে, এবং আপন আকাঙ্খার পিছনে ছুটেছে, তাদের অনুতাপ প্রদর্শন তাদেরকে যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেবে নাঃ

"সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করব; আগে যা করতাম, তা করব না। আল্লাহ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি ভোগ কর, জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ফাতিরঃ ৩৭)

আল কুরআন ব্যাখ্যা করে কিভাবে আল্লাহ্‌র গোলাম হওয়া যায়ঃ মানুষকে যেহেতু সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্‌র গোলামী করবার জন্য, সেহেতু কিভাবে তাঁর আনুগত্য করতে হবে তা জেনে নেওয়া মানুষের কর্তব্য। আল কুরআনে এটাও বর্ণিত হয়েছেঃ

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ইবাদাতের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি – যা তারা অনুসরণ করে। সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এই ব্যাপারে বিতর্ক না করে ।" (সূরা হাজ্জঃ ৬৭)

আল্লাহ্‌ তাঁর গোলামের নিকট যে-রূপ উপাসনা দাবী করেন, আল কুরআন আমাদেরকে তার ধরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে । উপাসনা (ইবাদাত), নিয়মিত প্রার্থনা (সালাত), বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) ইত্যাদি সম্পর্কে সচরাচর যেসব প্রশ্ন জাগে, সেগুলির জবাব আল কুরআনে খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া, বিশ্বাসীর যেসব গুণাবলী আল্লাহ প্রশংসা করেন, যেসব আচরণ একজন বিশ্বাসীর বর্জন করা উচিত, যে নৈতিক মূল্যবোধ একজন বিশ্বাসী প্রদর্শন করে – সবকিছুর ব্যাখ্যা আল কুরআনে রয়েছে। বিনয়, ত্যাগের মনোভাব, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, দয়া, সহিষ্ণুতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং এই জাতীয় নৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহ্‌র একজন উত্তম গোলামের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মন্দকর্ম, ভ্রান্ত মনোভাব এবং মানুষের সঙ্গে অন্যায় আচরণকে আল কুরআনে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্বাসীগণকে এগুলো থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌ এই মহাবিশ্ব এবং মানুষকে শূণ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। সকল জীবের মধ্যে বিশেষভাবে মানুষকে অনেক অনুগ্রহ প্রদান করেছেন। এর মধ্যে "আত্মা" হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য। এটির জন্যই মানুষ সচেতন জীব হয়েছে। মানবসন্তানকে প্রদত্ত অনুগ্রহ এতই অধিক যে, আল্লাহ্‌ ঘোষণা করছেন, মানুষ শত চেষ্টাতেও কখনো তার সংখ্যা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না(সূরা আন নাহলঃ ১৮)। অতএব, মানুষকে ভাবতে হবে কেন তাকে এসবঅনুগ্রহ করা হয়েছে এবং বিনিময়ে তার নিকট কি দাবী করা হয়েছে।

মানুষকে এটা উপলব্ধি করার যোগ্যতায় ভূষিত করা হয়েছে যে, তার উপভোগ করা সকল অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র দেওয়া। কাজেই সে সহজেই উপলব্ধি করে যে, তার উচিত এগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করা। তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পন্থা না-ও জানতে পারে। এই পর্যায়ে আবারো আল কুরআনই তাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

আল কুরআনে আল্লাহ্‌ প্রথমতঃ দাবী করেন যে, তাঁর গোলামেরা আজীবন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করবে। এই লক্ষ্যে একজনের জীবনের প্রতিটি মূহূর্তে তাকে অবশ্যই আপন ইচ্ছা-আকাঙ্খার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সম্মতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অন্যথায় সে আপন নফস বা আশা-আকাঙ্খার গোলামে পরিণত হবেঃ"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখ না যে আপন কামনা-বাসনাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? . . " (সূরা আল ফুরকানঃ৪৩)

এই দাবী অনুসারে, একজন বিশ্বাসী তার সমগ্র জীবনব্যাপী, সকল বিকল্প পর্যালোচনা করে, হোক তা কোন ঘটনা, চিন্তা বা মনোভাব। সে সেটিই বেছে নেয়, যেটি আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়।

ফলে একজন বিশ্বাসী, যে তার জীবন অতিবাহিত করে আপন স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, সে পুরস্কার হিসাবে অনন্তকালীন সুখ আশা করতে পারে। অতএব, আল্লাহ্‌র গোলামী করাটা কেবল নিজের কল্যাণের জন্যই। কারো প্রার্থনা, উপাসনা, কিংবা উত্তম কর্মের কোন প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই। আল কুরআনে একথাই বিবৃত হয়েছেঃ "যে কেউ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে; আল্লাহ তো প্রচুর্যময়, অভাবমুক্ত।" (সূরা আনকাবুতঃ৬)

আল কুরআন মানুষকে উপদেশ দেয় কিভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্য করতে হবেঃযে পরিবেশে কুরআনের নীতি অগ্রাহ্য করা হয়, সেখানে ভাল-মন্দের পার্থক্য করার জন্য নানা রকম ত্রুটিপূর্ণ মানদণ্ড স্থাপন করা হয় । এরূপ বহুবিধ মানদণ্ডের উপরে নির্ভরতার ফলে আচরণগত ভুল এবং ক্ষতিকর ফল লাভ হয়। উদাহরণ স্বরূপ,

যে ব্যক্তি কেবল একবার অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করেছে, তাকে কয়েকবার অপরাধ সংঘটনকারীর তুলনায় বেশি নিরপরাধ মনে করা হয়। একজন চোর নিজেকে একজন খুনীর চেয়ে কম ক্ষতিকর মনে করে; আবার খুনী ভাবে, সে ততটা মন্দ নয়, যেহেতু সে জীবনে মাত্র একটা খুন করেছে। তার মতে, যে ব্যক্তি পেশাদার খুনী, সে-ই মন্দ লোক। পক্ষান্তরে, একজন পেশাদার খুনী নিজের সঙ্গে একজন মনরোগগ্রস্ত খুনীর পার্থক্য করে থাকে এবং নিজেকে তার তুলনায় নিষ্পাপ মনে করে। একই কথা তাদের ক্ষেত্রেও সত্য যারা অপরাধী না হলেও আচরণগতভাবে নীতিহীন। যে ব্যক্তি আড্ডাবাজি করে, সে এই অন্যায়কর্মকে নগন্য মনে করে, কারণ কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে সে এটা করে না। যে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে মনে করে, অন্তরের দিক থেকে সে ভালো। কারণ, সে তখনই বিদ্বেষ পোষণ করে, যখন তা করাটা সঠিক। এরূপ যুক্তির তালিকা আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এসবলোক নিজেদেরকে নিরপরাধ মনে করে এবং নিজের অপরাধের ঘৃণ্যতা কখনো স্বীকার করতে চায় না। অথচ, তাদের অজুহাতগুলো সব ভ্রান্ত এবং তারা সবাই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। এর কারণ হল, যে জিনিসটা কাউকে ভ্রান্তিহীন করতে পারে তা হল, আল্লাহ্‌র কিতাবের পূর্ণ অনুসরণ। পক্ষান্তরে, যখন কেউ কুরআনের নৈতিকতার বিরুদ্ধে কাজ করে, তখন সে অপরাধী, নিজে সে যা-ই দাবী করুক না কেন।

আমরা জানি, মানবাত্মার দুটি দিক রয়েছেঃ বিবেক এবং প্রবৃত্তি। বিবেক সব সময় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ভাল এবং সঠিক কর্ম করতে। পক্ষান্তরে, তার প্রবৃত্তি (নফস) তাকে মন্দকর্মে উদ্বুদ্ধ করে যার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুমোদন নেই। পক্ষান্তরে, বিবেকের পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি জোরালো বিশ্বাস এবং ভীতির সাহায্যে।

ধর্ম মানুষকে সাহায্য করে ভাল ও মন্দের পার্থক্য করার মত সচেতনতা অর্জন করতে। কেবল আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থপন এবং তার পরিপূর্ণ অনুসরণ মানুষকে সুস্থ্য চিন্তাশক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করে । উদাহরণ স্বরূপ, যে বিশ্বাসী কুরআনের দাবী অনুসারে আল্লাহকে ভয় করে, সে এমন এক মানদণ্ড লাভ করে যার সাহায্যে সঠিক ও বেঠিকের বিচার করা সম্ভবঃ

“হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অসীম।” (সূরা আনফালঃ ২৯)

সঠিক ও বেঠিক, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার যে অনন্য উৎস, সেটি হল আল কুরআনঃ

“মহান সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যেন সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।” (সূরা আল ফুরকানঃ১)

আল কুরআনে সঠিক ও বেঠিকের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে আমাদের বিবেক ও সচেতনতা প্রয়োগ করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি বিশেষ আয়াতে সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে একটি বোধগম্য ধারণা দেওয়া হয়েছেঃ

“পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ ফেরানোতে কোন পূণ্য নেই, তবে পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ্‌, পরকাল, ফেরেশতাকূল, অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং নবী-রসূলগণে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্‌-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদের এবং দাসমুক্তির জন্য টাকা-পয়সা দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সঙ্কটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রামে ধৈর্য্যধারণ করলে। এরাই সত্যপরায়ণ এবং আল্লাহ-ভীরু। ” (সূরা আল বাকারাঃ ১৭৭)

পরিবার বা পূর্বপুরুষ হতে প্রাপ্ত প্রতিটি বিশ্বাস, কিংবা সামাজিক পরিবেশ হতে অর্জিত, সহজাতভাবে অনির্ভরযোগ্য যতক্ষণ না এটা কুরআনের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যেমন, উত্তম ব্যক্তির বর্ণনা দিতে সমাজে কতিপয় সাধারণ কথা ব্যবহৃত হয়। “সে একটা মাছিকেও আঘাত করে না”– এই ধরণের একটা কথা। তবে, কোন ব্যক্তি মাছিকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকলেও কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণে যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে ভাল মানুষ বলা কঠিন। যেটি আসলে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, কুরআন-নির্দেশিত মন্দ কাজ পরিহার করা, ভাল কাজ করা। কারো কারো কাছে দরিদ্রদের জন্য

করুণা বোধ, তাদেরকে এবং শিশুদেরকে সাহায্য করা "ধার্মিক" ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হবার জন্য যথেষ্ট। তবে কুরআন ঘোষণা করছে যে, এসবকর্মকাণ্ড কাউকে সত্যিকারের বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করার জন্য যথেষ্ট নয়। সত্যিকারের বিশ্বাসী হল সেই ব্যক্তি, যে নিখুঁতভাবে কুরআনের নির্দেশনা মেনে নেয় এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেয়।

আল কুরআন মানুষকে ইহজগতের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা দেয়ঃ মানবতার সত্যপথের দিশা প্রদানের সর্বশেষ বিশুদ্ধ প্রত্যাদিষ্ট দিকনির্দেশনা আল কুরআনে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, আমাদের জীবনের লক্ষ্য হল কেবল তাঁর গোলামী করা। সেই সঙ্গে আল কুরআন এ ব্যাপারেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, পৃথিবী হল সেই স্থান যেখানে আল্লাহ্‌ এই গোলামীর পরীক্ষা নিবেন। সেই মোতাবেক, এই পরীক্ষার পূর্বশর্ত হিসাবে, আল্লাহ্‌ মানুষকে সেই সব বিষয়ের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যেগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে প্রলুব্ধ করে পথভ্রষ্ট করার জন্য; সেগুলোর প্রকৃতি অত্যন্ত "প্রতারণাপূর্ণ" বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (সূরা আল ইমরানঃ১৮৫) আল কুরআনে অনেক আয়াত আছে যেখানে এই পার্থিব জীবনের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি লক্ষ্যনীয়ঃ

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে বিপুল পুরস্কার।" (সূরা তাগাবুনঃ ১৫)

মানুষের নিকট পার্থিব কামনা-বাসনাকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়েছেঃ

"স্ত্রী-সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদিপশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহকালের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময় ।" (সূরা আল ইমরানঃ ১৪)

“তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করা হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা; যা-কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করবে না?” (সূরা আল কাসাসঃ ৬০)

সামাজিক মর্যাদা, সমৃদ্ধি, সন্তানাদি, উন্নত জীবনযাত্রা, দারিদ্র, নিম্ন জীবনমান – এগুলো হল পৃথিবীতে মানুষকে পরীক্ষা করার পন্থা। কুরআনের একটি আয়াতে ঘোষণা করা হচ্ছেঃ

“তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের উপরে মর্যাদাবান করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল ও করুণাময়।” (সূরা আনআমঃ ১৬৫)

জীবন ও মৃত্যু হল মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। নিম্নোক্ত আয়াতে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছেঃ

“তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম; তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।” (সূরা মুলকঃ ২)

এই পৃথিবীতে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে ঘিরে সকল অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে । (সূরা আল আম্বিয়াঃ৩৫) মানুষকে প্রদত্ত এবং তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সকল আনুকূল্য এই পরীক্ষারই অংশঃ

“মানুষ তো এই রকম যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মাণিত করেছেন।।’ এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিযক সঙ্কুচিত করে, তখন সে বলে,‘আমার প্রভু আমাকে অপদস্ত করেছেন’।” (সূরা আল ফাজরঃ ১৫-১৬)

এই আয়াতে এমন অসচেতন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যে এই পরীক্ষার প্রকৃতি উপলব্ধি করতে অক্ষম।

বিশ্বাসীগণকে এরূপ অসচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং বার বার তাদেরকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছেঃ

"তাদের দিকে দৃষ্টি দিও না , যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি, তাদের পরীক্ষা করার জন্য। তোমার . প্রভুর পুরস্কার অনেক উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী।" (সূরা ত্বাহাঃ ১৩১)

তারপরও এই ধরণের লোক এসববাস্তবতা উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে, তারা এসবসুযোগ-সুবিধার প্রতারণামূলক প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়। এই জীবনের প্রতি আসক্তি এবং সম্পদের আকাঙ্খা তাদেরকে পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের পথে বিরাম নিতে দেয় না। ইতোমধ্যে তারা সংকট ও জটিলতার সম্মুখীন হলে গভীর হতাশা বা অসহায়ত্ব বোধ করে। আল কুরআনে এরূপ মনোভঙ্গীরও উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"যদি আমি মানুষকে আমার অনুগ্রহ প্রদান করি ও পরে তার নিকট থেকে তা প্রত্যাহার করি, তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হবে। আর যদি দুঃখ-দৈনের পরে আমি তাকে সুখের স্বাদ প্রদান করি, তখন সে অবশ্যই বলবে, 'আমার বিপদ-আপদ কেটে গেছে', আর সে আনন্দে উদ্বেলিত হবে, গর্বিত হবে।" (সূরা হুদঃ৯-১০)

বিশ্বাসীরা, যারা সব ঘটনা কুরআনের দিকনির্দেশনা অনুসারে ব্যাখ্যা করে, তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের কথা স্মরণে রাখে এবং মানুষের প্রকৃত বাসস্থান (অর্থাৎ জান্নাত) অর্জনের জন্য অবিরাম চেষ্টায় রত থাকে। "পৃথিবীতে বাস কর আগন্তুকের মত বা মুসাফিরের মত"(সহীহ বুখারী)– রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এই বাণী অনুসারে তারা জানে যে, এই জগতে তাদের অবস্থান অল্প সময়ের জন্য এবং তাদের প্রকৃত বাসস্থান পরলোকে। এ-জন্য সত্যিকারের বিশ্বাসীগণ কখনো বিপথগামী হয় না যখন তারা বিপুল আনুকূল্য পায়, কিংবা বিষণ্ন বা হতাশ হয় না যখন তারা এসবথেকে বঞ্চিত হয়। অনুগ্রহ ও বঞ্চনার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে– এই ব্যাপারে সচেতন থাকায় তারা সব সময় সেই দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করার চেষ্টা করে, যা আল্লাহ্‌র

সর্বাধিক পছন্দনীয়। নিম্নোক্ত আয়াতের কথা স্মরণে রেখে তারা কোন ঘটনার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়ঃ

“প্রতিটি প্রাণিকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা খরে থাকি এবং আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” (সূরা আম্বিয়াঃ ৩৫)

এই পর্যায়ে এসে, একজন উপলব্ধি করে যে, আল কুরআন হল আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহের সুস্পষ্ট প্রকাশ; কারণ বিশ্বাসীরা আল কুরআনের মাধ্যমে সবচেয়ে নির্ভুল বাস্তবতা অবগত হয়।

আল কুরআন আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, পরলোক হল মানুষের প্রকৃত বাসস্থানঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের বিষয়গুলি সম্পর্কে মানুষ কিছু জানতে অক্ষম। “ভবিষ্যত” হল এমনি একটি বিষয়। কেহই নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না, কয়েক সেকেণ্ড পরে কি ঘটবে। সামর্থের এই সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতি যুগে মানুষ ভবিষ্যত সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে বিশেষতঃ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে কৌতূহলী থেকেছে।

এসব প্রশ্নের সুনিশ্চিত, নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন আল্লাহ, যিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সমগ্র মানব জাতির, মৃত্যুর, বিচার দিবসের, বেহেস্ত-দোযখের, অতীত-ভবিষ্যতের এবং পরলোকের স্রষ্টা। আল্লাহ এই বিশ্বজগত এবং সমস্ত জীবজগত সৃষ্টি করেছেন অস্তিত্বহীনতা থেকে এবং প্রতিমুহূর্তে সৃষ্টি করে চলেছেন। আল্লাহ সময়ও সৃষ্টি করেছেন, যা বিশ্বলোকের অন্যতম একটি মাত্রা (ডাইমেনশন); এটার বন্ধনে সমগ্র জীবকূল আবদ্ধ। যাহোক, আল্লাহ সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ নন; তিনি নিশ্চিতভাবেই স্থান ও কালের ধারণার ঊর্ধ্বে। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সময়হীনতার মাত্রায়।

আমরা যেসব জিনিসকে অতীত বা বর্তমান বিবেচনা করি, সেসব আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এক মুহূর্তে। বিস্তারিত জানতে এই লেখকের Timelessness and the Reality of Fate এবং Eternity Has Already Begun নামক গ্রন্থদ্বয় দেখুন।

ভবিষ্যতসহ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের সবকিছুকে উল্লেখ করা হয়েছে "অদৃশ্য" (গায়েব) বলে। পরকালও ততদিন পর্যন্ত "অদৃশ্য" বা গায়েবের অংশ, যতদিন মানুষ জীবিত থাকে। আল কুরআন মানুষকে পরকালের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানাচ্ছে এবং সেই জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে। প্রত্যেক যুগে দার্শনিকেরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অনেক অনুমান করেছেন। এর সাথে রয়েছে অনেক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী যাদের মধ্যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস রয়েছে। যাহোক, পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভুল তথ্য দিয়েছে সত্য-ধর্ম।

কেবল সত্যের ধর্ম মানুষকে জানাচ্ছে যে, এই পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং পরকালের অনন্ত জীবন মানুষের প্রতীক্ষারত। এমন এক দিন আসবে, যখন প্রত্যেকে ভাল বা খারাপ কর্মের জন্য আল্লাহর পুরস্কার বা শাস্তি পাবে– এটিও আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল কুরআন হল সেই অদ্বিতীয় উৎস, যেখান থেকে আমরা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত, বিচার দিবস, বেহেস্ত এবং দোজখ সম্পর্কে তথ্য পাই। আল্লাহর শেষ অবতীর্ণ গ্রন্থ আল কুরআনের অনেক আয়াতে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষের প্রকৃত আবাস হল পরকাল। একটি আয়াতে বলা হচ্ছেঃ

"এই পৃথিবীর জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয় এবং যারা আল্লাহ্-ভীতির পথ অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?" (সূরা আনআমঃ ৩২)

সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রভাব

মানুষ এবং সমাজের উপরে বিশ্বাসহীনতার নানা রকম নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যে সমাজ ধর্ম থেকে অনেক দূরে, তার সদস্যদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল অবিচার, স্বার্থপরতা এবং অবিশ্বস্ততা। এটা হল বিশ্বাসহীন সমাজের অনিবার্য প্রকৃতি। কেবল ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যক্তি এবং সমাজের নৈতিক শুদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারে। যাদের আল্লাহ এবং পরলোকে বিশ্বাস আছে, কেবল তারাই দায়িত্বশীল আচরণ করে। কারণ, তারা জীবন ধারণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে তারা সতর্কতার সাথে অপকর্ম বর্জন করে, সেসব দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করে যা আল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিত নয়। যে সমাজে এরকম লোকের আধিক্য থাকে, সেটা হয়ে ওঠে সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত এক সমাজ।

যাহোক, একজন অবিশ্বাসী যেহেতু স্বীকার করে না যে, শেষ পর্যন্ত তাকে তার কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে, সেহেতু সে আল্লাহর নির্দেশিত সীমা মেনে চলে না। বিচার-দিবসকে বিবেচনা না করায় সে স্রেফ তার বদমায়েশী নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন বোধ করে না। যদিও সে সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য কতিপয় আচরণ পরিহার করে, তবুও অনেক লোক প্রণোদনা, উৎসাহ কিংবা সুযোগ পেলে অন্যান্য দুষ্কর্ম করতে দ্বিধা করে না।

বিশ্বাসহীনতাকে বেছে নেওয়া কিছু কিছু লোকের সমস্যা শুরু হয় এমনকি এই পার্থিব জীবনেই। কারণ, প্রত্যেকে তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে জানে যে, তার উচিত ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন করা। নিশ্চিভাবে প্রত্যেকে বিবেক নামক গুণে ভূষিত। কিন্তু এই গুণটি যেহেতু বিশ্বাসীদের সাথে ঐক্যতানে গাঁথা, সেহেতু এটা সেসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রায় অকেজো হয়ে যায়, যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে জীবন যাপন করে না। অন্য কথায়, বিবেকের প্রতি কর্ণপাত না করায় ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়া লোকেরা আত্মিক দুর্দশার অভিজ্ঞতা লাভ করে। বাস্তবিকভাবে প্রত্যেকে জানে যে, তার

একজন স্রষ্টা আছেন, তাঁর নিকট সে দায়বদ্ধ এবং তার উচিত নৈতিক শুদ্ধতা প্রদর্শন করা। তবে এগুলি অবশ্যই তার পার্থিব আশা-আকাঙ্খার সাথে সাংঘর্ষিক।

এই কারণেই একজন ব্যক্তি হয় সম্পূর্ণরূপে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে, কিংবা অজুহাত দেখায় , "আমি সৎ, ভাল এবং দায়িত্ববান"। এই অজুহাতে সে কুরআনে বর্ণিত জীবন-ব্যবস্থা এড়িয়ে চলে। যাহোক, উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ তার অবচেতন মনে জানে, তার এমন জীবন যাপন করা উচিত যা আল্লাহর অনুমোদিত। ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরবর্তী সমাজগুলোতে মানসিক যন্ত্রণা, সমস্ত মনস্তাত্বিক এবং আত্মিক সমস্যার মূলে রয়েছে এই আত্মিক দুর্দশা; এটাকে আমরা বলি "বিবেকের দংশন"।

যেসব লোক দুনিয়াতে থাকতেই এই দুর্দশার অভিজ্ঞতা অর্জন শুরু করে, তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে নিচের আয়াতেঃ

"তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে বল, কখন এই প্রতীজ্ঞা পূর্ণ হবে? বল, 'তোমরা যে বিষয় ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ, সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে।" (সূরা নমলঃ ৭১-৭২)

"বিবেকের দংশন" হল অবিশ্বাসীর জন্য পরলোকের অনন্ত এবং অসহ্য আত্মিক যন্ত্রণার অতি সামান্য অংশ। মানুষ পার্থিব এই যন্ত্রণায় যে কারণে ভোগে তা হল এই যে, সে এমন এক জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছে, যা সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। যতক্ষণ সে তার অধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গী আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ তাকে এই আত্মিক যাতনা ভোগ করতেই হবে। এজন্যই সে তার বিবেকের কণ্ঠরোধ করার উপায় অনুসন্ধানের তাগিদ অনুভব করতে থাকে। এভাবে সে মানসিক যাতনা থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করে।

মানসিকভাবে এবং শারীরীকভাবে মানুষ স্বভাবতঃ ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি ঝোঁক-প্রবন। আল্লাহ শুধু মানুষ সৃষ্টি করেননি, বরং তার জীবন যাপনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহর সীমা অতিক্রম করলে স্বভাবতঃই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। আগের অধ্যায়গুলিতে যেমনটি উল্লেখ করা

হয়েছে, এসবজটিলতা হল আসলে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত দুর্দশা, যা সমগ্র ইতিহাসব্যাপী মানবতার উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে আসছে। এসবজটিলতা দূরীকরণের একক এবং একমাত্র উপায় হল ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুসরণ। ধর্ম এসবজটিলতার প্রত্যেকটির বাস্তব সমাধান প্রদান করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুসরণ অপরাধ প্রতিরোধ করেঃ যে ব্যক্তি ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসারে জীবন যাপন করে না, এবং সেই কারণে তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি কিংবা শাস্তি প্রত্যাশা করে না, সে কোন্ কারণে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় অপরের স্বার্থ এবং কল্যাণে কাজ করবে? তার ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুসারে ধরে নেওয়া হয়, সে এই পৃথিবীতে একবারই জীবনকাল কাটাবে। সে ভাববে যে, তার সবচেয়ে আরামদায়ক জীবন যাপন করা উচিত। সে যা কিছু চায় তার পিছনে ছুটবে এবং যা কিছু পছন্দ করে, তা-ই করবে। আল কুরআন এই যুক্তধারাকে এভাবে পেশ করেছেঃ

"তারা বলে, 'একমাত্র এই পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন; আমরা মরি ও বাঁচি কাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' আসলে এই ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই তারা কেবল মনগড়া কথা বলে।" (সূরা আল জাসিয়াঃ ২৪)

এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণা যে-ই পোষণ করে, সে সব রকম পাপকর্ম এবং অনৈতিকতার কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। সে নির্লজ্জের মত মিথ্যা কথা বলতে পারে, চুরি করতে পারে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারে, হিংসাত্মক ঘটনা ঘটাতে পারে, মিথ্যাচারকে গ্রহনযোগ্য বলে মেনে নিতে পারে, প্রতারণা করতে পারে, সুযোগ পেলেই অন্যদের শ্রম এবং সম্পদ শোষণ করতে পারে। এরকম লোককে অন্যায় থেকে ফেরানোর আসলেই কোন উপায় নেই।

এক সময় সে আপন জৈবিক সত্ত্বার দাসে পরিণত হয়ে যায় এবং প্রবৃত্তির নির্দেশনা কোন প্রকার দ্বিধা ছাড়াই মেনে চলে। অন্যায় কাজে লিপ্ত হবার ব্যাপারে সে কোন

সীমারেখা দেখতে পায় না। তার স্বার্থের প্রয়োজন যদি দেখা দেয়, তাহলে হত্যাকাণ্ড না ঘটানোর কোন কারণ সে খুঁজে পায় না। দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে এই ধরণের ঘটনার শিরোনাম লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর পাতায় পাতায় এমন অনেক খবর দেখা যায়, যেখানে কেউ-বা তার প্রতিবেশীকে হত্যা করেছে অলঙ্কারের জন্য, স্ত্রী তার স্বামীকে হত্যা করেছে ক্রোধের বশে, পিতা তার সন্তানকে নির্যাতন করেছে, কিংবা কেউ টাকার জন্য আপন পিতা-মাতাকে হত্যা করেছে। সন্দেহ নেই, এরকম অসংখ্য ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে যার অনেকগুলি অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। এই সবকিছু স্পষ্ট প্রমান বহন করে যে, মানুষ তার প্রবৃত্তির অন্ধ দাসে পরিণত হয়েছে। আত্মিকভাবে তারা এমনকি জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। আল কুরআনে এই ধরণের ব্যক্তিকে বলা হয়েছে "সীমালঙ্ঘনকারী, পাপী"। (সূরা আল মুতাফফিফিনঃ ১২)

যে সমাজের মানুষ যে কোন সময় যা কিছু করতে পারে, সেখানে বাসে, বা বাজারে বা থিয়েটারে আপনার পাশের সাধারণ লোকটি সম্ভাব্য বিপদের কারণ হতে পারে। হতে পারে, সে একজন ডাকাত, একজন খুনী কিংবা একজন ধর্ষক। তাছাড়া, এরকম বিপজ্জনক একজন ব্যক্তি সুদর্শন হতে পারে, হতে পারে উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী। একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকার এই বিষয়টি নিশ্চিত করেঃ

প্রশ্নঃ আপনি বলছেন, খুন সব সময় আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেক্ষেত্রে আপনি কি কোন এক দিন হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পছন্দ করবেন?

উত্তরঃ অনেক সময় এমন হয়েছে, আমি হত্যাকাণ্ড ঘটাতে চেয়েছি। অবশ্য বিশেষ কারো কথা আমার মনে আসেনি। আমি স্রেফ চাই দৈনিক আট-নয়জন মানুষ খুন করতে। মানুষের আত্মায় এরকম সহিংসতার প্রতি ঝোঁক আছে। আমি মনের গভীরে এটা অনুভব করি। তবু, একটা . . . খুন ততটা ভাল শোনায় না; মোটকথা, রক্ত, মৃতদেহ, পুলিশের গাড়ির সাইরেন, পুলিশ– এসব রয়েছে . . . এসব ধরণের বাজে জিনিস. . . এগুলো সত্ত্বেও খুন আমাকে সব সময় প্রলুব্ধ করে।

প্রশ্নঃ আপনি কোন্ ধরণের হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পছন্দ করেন?

উত্তরঃ আমি কেবল বন্দুক ব্যবহার করতে পছন্দ করি। বিষ প্রয়োগে যে খুন, তাতে তটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয় না; এটা চোরের মত গোপন পদ্ধতি।

জেনে বিস্মিত হবেন, এই সাক্ষাতকার যিনি দিয়েছেন, তিনি সমাজে শিক্ষিত, সচেতন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তিনি এরকম সন্ত্রাসী মনোভঙ্গী লালন করেন এবং নির্দ্বিধায় তা প্রকাশও করছেন। এটা নিশ্চিতভাবে এমন এক সমাজের সাধারণ মানসিকতার পরিস্কার চিত্র তুলে ধরছে, যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধের পরোয়া করা হয় না। এই উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, সেসব লোকের প্রকৃতি কত ভয়ঙ্কর যাদের আল্লাহতে বিশ্বাস বা ভয় নেই। যে হত্যাকাণ্ড অবিশ্বাসীরা সহজেই সাধন করে, সেই ব্যাপারে কুরআন ঘোষণা করছেঃ

"এই কারণেই বণী ইসরায়েল জাতির উদ্দেশ্যে এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ার বুকে ধ্বংসাত্মক কাজ করার হেতু ছাড়া কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবতাকে হত্যা করল।" (সূরা মায়িদাঃ ৩২)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য একটি আয়াতে একথাও বলা হচ্ছে যে, যারা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবে, তারা চিরদিন দোজখে শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা নিসাঃ ৯৩) অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে কাউকে হত্যার কল্পনাও করবে না। কুরআনে এই ঘটনাটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে আদম (আঃ)-এর দুই পুত্রের ঘটনার মাধ্যমে। আদম (আঃ)-এর দুই পুত্রের একজন তার ভাইকে হত্যা করতে চাইল শুধু ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে। আক্রান্ত ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করতেন; তিনি অসাধারণ মনোভাবের নজির স্থাপন করলেনঃ

"আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না; আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।" (সূরা মায়িদাহঃ ২৮)

এই পর্যায়ে এসে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, বিশ্বাসীরা কখনো আল্লাহর অপছন্দনীয় কিছু মনে স্থান দেয় না। বিষয়টির খুব স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বিশ্বাসীদের প্রতি রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নির্দেশ থেকেঃ" না ক্ষতি করা উচিত, না ক্ষতির পাল্টা ক্ষতি করা উচিত।" (সূনান ইবন মাজাহ) পক্ষান্তরে, অবিশ্বাসীরা মনে করে, অন্যায়কর্মে লিপ্ত হবার ব্যাপারে তারা স্বাধীন।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা সমাজ থেকে চুরি, ঘুষ, মিথ্যাচার এবং হত্যাকাণ্ড নির্মূল করে। যে ব্যক্তি ইসলামী নীতির প্রতি নিষ্ঠাবান থাকে, সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলে। তার জৈবিক সত্ত্বা যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা সে অগ্রাহ্য করে।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসারে জীবন যাপন করে না, সে সর্বদা আপন আগ্রহ বা প্রয়োজনের দাবী অনুসারে আচরণ করে। আর ঠিক এই জিনিসটাই সব রকম অন্যায়-অপকর্মের পথ দেখায়। উদাহরণ স্বরূপ, চুরি করে কেউ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারে, কিন্তু ধর্ম এটা নিষেধ করে। আসলে চৌর্যবৃত্তি চোর এবং যার চুরি হয়েছে, উভয়েরই ক্ষতি সাধন করে। একজনের সমস্ত সঞ্চয় মাত্র এক রাত্রেই চুরি হয়ে যেতে পারে। অপরপক্ষে, এটা চোরের বিবেকের দংশনের কারণ হতে পারে। এসব কারণে, ধর্ম এধরণের অপকর্ম নিষিদ্ধ করেছে এবং এই পৃথিবীতেই একটি সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির পথ করে দিয়েছে।

এই পর্যায়ে এসে একজন অবিশ্বাসী ব্যক্তি হয়ত বলবেনঃ 'আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি না; কিন্তু আমি প্রতারণাও করি না।' আসলে এটা খুবই সম্ভব যে, এই ব্যক্তি তার নীতির কারণে সারা জীবন কোন প্রতারণা করেনি। তবে কোন বিশেষ অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে সে প্রলোভনের মোকাবেলা করতে সক্ষম না-ও হতে পারে এবং অন্যদেরকে প্রতারিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, তার টাকার চরম প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, কিংবা সে এমন পরিবেশে থাকতে পারে, যেখানে প্রতারণাকে গ্রহনযোগ্য বিবেচনা করা হয়। আরো নানা রকম পরিস্থিতি প্রতারণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে এবং সেই ব্যক্তিকে পাপের পথে টানতে পারে।

যাহোক, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে ধর্ম কঠোরভাবে নিষেধ করে। যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করে, সে কখনো অন্যকে প্রতারিত করার প্রয়াস পায় না। প্রতারণা হল এক ধরণের অবিচার; অনেক আয়াতে এটা নিন্দিত হয়েছেঃ

"একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে আত্মস্মাৎ করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের কাছে পেশ করো না।" (সূরা আল বাকারাঃ ১৮৮)

আল কুরআনের দাবী হল বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনঃ আমাদের একালে এত বেশি সমস্যার সমাধান না হওয়ার একটা বড় কারণ হল, সমস্যাবলীর সমাধানের দায়িত্ব এমন সব লোকের উপর অর্পন করা হয়, যাদের ঐ ব্যাপারে না আছে যোগ্যতা, আর না মেধা। যেসব সমাজে ইসলামের নৈতিক নির্দেশনা প্রয়োগ করা হয় না, সেখানে এমন অনেক ব্যক্তি থাকে যাদের সেই দক্ষতা নেই, যা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া, যদি তাদের সেই দক্ষতা থেকেও থাকে, তাহলেও অপরের কল্যাণ বা মানবতার সেবায় কাজ করার অঙ্গীকার তাদের থাকে না। প্রায়শঃ যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করা হয়, সেটা তাদের অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নয়, বরং পারস্পরিক স্বার্থ এবং সুবিধা।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন কারখানার মালিক যখন মৃত্যু বরণ করেন বা অবসর নেন, তখন তার পুত্র সাধারণতঃ সেই কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করেন। অথচ, যখন এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন বিবেচনা করা হয় না, সেই উত্তরাধিকারীর কারখানা পরিচালনার জ্ঞান এবং দক্ষতা আছে কি-না। তাছাড়া, এই কাজ তার অপছন্দনীয়ও হতে পারে। তবুও অন্য পেশা যেহেতু তাকে কাঙ্খিত সফলতা, নিরাপত্তা এবং সম্মান না-ও এনে দিতে পারে, সেহেতু সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দায়িত্বটি গ্রহন করে। পটভূমি যদি এমনটিই হয়, তাহলে কর্মক্ষেত্রে উদ্ভূত একটি সামান্য সমস্যাও সে মোকাবেলা করতে

অক্ষম হবে, কিংবা সময়মত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহনে অপারগ হবে। এতে করে কালে আরো নাটকীয় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

যাহোক, যে পরিবেশে কুরআনের নীতিমালা মেনে চলা হয়, সেখানে এরকম সমস্যা কখনো উদ্ভূত হয় না। কারণ, কুরআন বিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দেয়, দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করতে, যাদের সেই বিশেষ কাজে দক্ষতা এবং জ্ঞান রয়েছেঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে; তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করবে, তখন ন্যায়-নীতির সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন। " (সূরা আন নিসাঃ ৫৮)

যে ব্যক্তির আল্লাহর উপরে বিশ্বাস আছে এবং ধর্মীয় বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে, সে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি মনোযোগী থাকে। অতএব, বিশ্বাসী লোকদের একটি সমাজ গঠিত হয় "তাদের নিয়ে যারা আস্থা এবং চুক্তিকে সম্মান করে, যারা তাদের স্বাক্ষ্যে অনড় থাকে (সূরা আল মা'আরিজঃ ৩২-৩৩)। এরূপ সমাজে প্রত্যেকে তার দায়িত্ব নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে পালন করে।

ইসলামি নৈতিকতা মানুষকে বিশ্বাসহীনতা এবং অবিশ্বস্ততা থেকে মুক্তি দেয়ঃ ধর্ম মানুষকে নির্ভরযোগ্যতা এবং বিস্বস্ততার ধারণা শিক্ষা দেয়। যে সমাজে আল কুরআনের মূল্যবোধ বিরাজ করে না, সেখানে এসব আশা করা নেহায়েত ভুল। কারণ, একজন ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতে– সমস্যা ও সংকটে, সুসময়ে ও দুঃসময়ে– অন্যদের প্রতি বিশ্বস্ত কেবল তখনই থাকে, যখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াস পায়। পক্ষান্তরে, কেউ যদি চিন্তা করে যে, তার কৃতকর্মের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না, কিংবা তার দুষ্কৃতির জন্য শাস্তি পেতে হবে না, তাহলে সে কেবল নিজের আগ্রহ এবং লাভের ভাবনা দ্বারা তাড়ির হবে। সে একজন পরিপূর্ণ স্বার্থপর ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

সমাজে এই ধরণের দৃষ্টান্ত প্রচুর। যে ব্যক্তি সম্মানজনক অবস্থান থেকে অবসর নেন, যে জনপ্রিয় ব্যক্তি আর জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন না, কিংবা যে সম্পদশালী ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেছেন, মানুষ তার থেকে দূরে সরে যায়। তদ্রুপ, কেউ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলে বন্ধু হারানোর তিক্ত অনুভূতি লাভ করে। কারণ, বন্ধুরা তখন তাকে ত্যাগ করে। খবরের কাগজগুলিতে প্রতিদিনই এরকম অবিশ্বস্ততার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, ব্যবসায়ের জগতে অংশীদারগণ পরস্পরকে প্রতারিত করে। এরূপ লাভ-তাড়িত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল প্রকার অনৈতিক আচরণের সাক্ষ্য মিলবে। কারণ, দৈনন্দিন জীবনে অর্থ-কড়িই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বন্ধুত্ব হল আরেক সামাজিক অবস্থা, যেখানে অবিশ্বস্ততা এক সাধারণ অভিজ্ঞতা। অবিশ্বাসীদের সমাজে মানুষ তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধুদেরকেও পরিত্যাগ করে, যখন তাদের বিশ্বস জন্মে যে, অন্য কোন বন্ধুত্ব বেশি ফলপ্রসূ হবে। এই কারণে অনেক মানুষ তাদের বন্ধু হারানোর ব্যথা পেয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তুচ্ছ কারণে স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরকে ত্যাগ করে, কিংবা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটায়। তারা এরূপ দায়িত্বহীনের মত অপকর্ম করতে পারে কারণ, তাদের ভ্রান্ত যুক্তিধারা অনুসারে, তারা যে অপকর্ম করে তা গোপন থাকবে। কারণ, কেউ তাদেরকে প্রত্যক্ষ করছে না। অতএব, তাদেরকে বাধা প্রদানের উপায় নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে অবিশ্বাসীদের সমাজের অধিকাংশ সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে অবিশ্বস্ততা এবং আস্থাহীনতা। এই মনোভঙ্গী একজন মানুষকে অন্যের সাথে ঘনিষ্ট হওয়াকে দ্বিধাগ্বিত করে তোলে।

বিশ্বাসহীন সমাজের বিকৃত যুক্তিধারা কেবল এই উদাহরণগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। খ্যাতি বা সৌন্দর্যের কারণে বিখ্যাত লোকেরা, যারা হাজারো ভক্তের ভালবাসায় সিক্ত থাকত, তারা যখন বৃদ্ধ হয় এবং আকর্ষণ হারায়, তখন নাটকীয়ভাবে ভক্তদের ভালবাসা হারিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এরূপ অধিকাংশ ঘটনায় লক্ষ্য করা যায়, তারা দারিদ্র এবং একাকিত্বের মধ্যে মৃত্যুর প্রহর গোনে। আকস্মিকভাবেই তাদের ভক্তবৃন্দ, বান্ধবকূল এবং খবরের কাগজ, যারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকত, তারা

স্রেফ উধাও হয়ে যায়। তারা যে প্রকার জীবন যাপন করে, এটা তার তিক্ত অথচ অপরিবর্তনীয় চিত্র।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এই বিশ্বাস দ্বারা যে, মানুষের উদ্ভব হয়েছে বানর-সদৃশ প্রাণি থেকে দৈবক্রমিক প্রক্রিয়ায়। এই কারণে কারো শারীরীক আকার এবং উন্নতি হল প্রধান মানদণ্ড যা তাকে সমাজে স্বাতন্ত্রমণ্ডিত করে। যখন এই মানদণ্ড চলে যায়, তখন অন্যের দৃষ্টিতে তার মর্যাদাও চলে যায়। সন্দেহ নেই, এই দর্শন এমন এক প্রাণির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে প্রস্তুত নয়, যে বানর-সদৃশ প্রাণি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সমস্ত মনোযোগ প্রদান করা হয় কোন ব্যক্তির টাকা বা খ্যাতির প্রতি। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক, অধিকতর সুন্দর এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিরা বয়স্কদের স্থান দখল করে এবং সমাজ বৃদ্ধদেরকে সরিয়ে দেয়, কারণ তাদেরকে আর প্রয়োজন নেই। সমাজের অধিকাংশ গঠিত হয় সেসব ব্যক্তিদেরকে নিয়ে, যারা মনে করে, তারা এসেছে বানর থেকে এবং পরিণত হবে ধূলিতে। তাদের দর্শন যেহেতু বিশ্বস্ততার মত মূল্যবোধ দাবী করে না, সেহেতু মানুষ তাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ন্যস্ত করে। তারা ভুলে যায় যে, একদা এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই তাদেরকে লালন-পালন করেছিল। আরো মন্দ ব্যাপার হল, এই বয়স্ক লোকগুলির সঙ্গে ঐসব প্রতিষ্ঠান দুর্ব্যবহার করে।

এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হৃদয় আপন পিতা-মাতার প্রতি যত্নহীন হয়ে থাকে, কিংবা হিংস্র দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। অবিশ্বস্ততা সব রকম মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মানবাত্মায় সংকট এবং বেদনা সৃষ্টিকারী এই সামাজিক সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে কেবল ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণের মাধ্যমে। মানুষ যখন ইসলামের নীতি আঁকড়ে ধরে, তখন তারা আর একে অপরকে মূল্যহীন মনে করে না। কারো সুন্দর চেহারা বা সম্পদ, কিংবা সামাজিক অবস্থান তার স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন বিবেচিত হয় না। বরং আল্লাহ-ভীতি এবং তার প্রদর্শিত নৈতিক শুদ্ধতা তাকে মূল্যবান করে তোলে। দেহ হল মানুষকে প্রদত্ত এক অস্থায়ী অনুগ্রহ। এই পৃথিবীতে মানুষকে পরীক্ষা করা হবে। সে এখানে এক সংক্ষিপ্ত জীবন যাপন করবে, তারপর সে

পরলোকের চিরস্থায়ী বাসস্থানে গমন করবে। পরলোকে তাকে বিচার করা হবে তার নৈতিক গুণাবলী অনুসারে। সেই কারণে কেবল ভাল গুণাবলীই গুরুত্ব পাবে। আল্লাহর দাবী হল, তাঁর বান্দাগণ একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। সেই অনুসারে, বিশ্বাসীগণ এর থেকে সন্তোষ লাভ করেন।

যখন ইসলামি নৈতিকতা বর্তমান থাকে, তখন আস্থা এবং বিশ্বস্ততার শ্রেষ্ঠ নজির লক্ষ্য করা যায়। সন্তান আপন মাতা-পিতার প্রতিপালন করে, তাদের বয়স যতই হোক না কেন। মাতা-পিতা, শিল্পী, বিদ্বজ্জন– যাঁরা নিজ দেশের সেবা করেছেন– তাঁদেরকে প্রিয়জ্ঞান করা হয়। যুবসম্প্রদায় তাদের পরিবারের বয়স্কদেরকে বার্ধক্যে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। তারা নিয়মিত তাদের দেখাশোনা করে এবং সর্বোত্তম উপায়ে তাদেরকে সাহায্য করে। এরকম সমাজে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আজীবন টিকে থাকে। বরং মানুষ বন্ধুর চেয়েও বেশি আপন, তথা ভাই বা বোনের মত হয়ে যায়। তাছাড়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অসুস্থতা বা সঙ্কটের কালে মানুষ সর্বোত্তম উপায়ে একে অপরকে সাহায্য করে থাকে। যেসব নারী-পুরুষ বিবাহের কথা ভাবে, তারা আল্লাহর কথা স্মরণে রেখে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রতি বিশ্বাস রেখে তারা একে অন্যের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা প্রদর্শন করে। এই নিষ্ঠা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে কখনোই পরিবর্তিত হয় না। উভয়ের একজন প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ বা শয্যাশায়ী রোগী হয়ে পড়লেও না। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ব্যক্তির তার স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠা, ভালবাসা বা মর্যাদাবোধ কমে যায় না, যদি সে অল্প বয়সে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। এটা কেবল এই কারণে যে, বিশ্বাসীরা তাদের আত্মাকে প্রিয়জ্ঞান করে, অন্য কিছুকে নয়। আসলে এরকম সংকটের সময়ে প্রদর্শিত ধৈর্য্য বিশ্বাসীদের জন্য আরো বেশি আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। মহানবী (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী চমৎকারভাবে বিশ্বাসীদের পারস্পরিক বিশ্বস্ততাকে তুলে ধরেছেঃ

"একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; সে তার ক্ষতি করে না কিংবা তাকে পরিত্যাগ করে না। কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে আল্লাহ তার

প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য দেবেন। কেউ যদি তার ভাইয়ের উৎকণ্ঠা দূর করে, তাহলে আল্লাহ পুনরুত্থানের দিন তার একটি উৎকণ্ঠা দূর করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

এই বুঝাপড়া ও নিষ্ঠা ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব এবং বিশ্বাসীদের সব রকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্য। প্রতিজ্ঞা পালন এবং চুক্তি মোতাবেক আচরণ হল বিশ্বাসীদের নির্ভরযোগ্য চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যে সমাজে কুরআনের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে মানুষের প্রতিজ্ঞা পালন এবং বিশ্বস্ততা আশা করা নির্বুদ্ধিতা হবে।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেউ হয়ত দাবী করতে পারে যে, অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও সে কখনো প্রতিজ্ঞা কিংবা বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। এমনটি হতে পারে যে, সে জীবনব্যাপী বিবেকহীন আচরণের দোষে দুষ্ট হয়নি। যাহোক, আগে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সে তার সুবিধা অর্জনের কথা ভাবতে পারে। এই ক্ষেত্রে সে নতুন পরিস্থিতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে পারবে না। অথচ পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, একজন বিশ্বাসী কখনো আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার মত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করার সাহস করে না।

যেখানে মানুষ আল্লাহর পথে চলে, সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করেঃ আল্লাহ মানুষকে এরকম পরিবেশ গঠন করতে নির্দেশ দেন, যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে। এরকম পরিবেশে ক্রোধ, আক্রোশ এবং অন্যান্য অনৈতিক মনোভাব লক্ষ্য করা যায় না, কারণ এগুলি আল্লাহর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

"যারা সচ্ছলতা এবং অভাবের মধ্যে দান করে এবং যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আল ইমরানঃ ১৩৪)

"যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কাজে থেকে বিরত থাকে এবং ক্রোধের সময় ক্ষমা করে দেয়।" (সূরা আশ শূরাঃ ৩৭)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও তাঁর অনেক বাণীতে বিশ্বাসীদেরকে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেনঃ "সেই ব্যক্তি শক্তিমান নয় যে অন্যকে কুস্তিতে পরাজিত করে, শক্তিমান তো সে যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।" (বুখারী)

আল্লাহ এভাবেই আল কুরআনে বিশ্বাসীদের বর্ণনা দিয়েছেন, আর বিশ্বাসীরা বিপরীত আচরণ না করার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান। কারণ, তাদের সামগ্রিক জীবন যাপনের ভিত্তি হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দে, তাদের পোষণ করা প্রতিটি মনোভাবে, তাদের ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপে তারা সেটাই করতে চেষ্টা করে, যা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট করে। আল্লাহ এমন আচরণ দাবী করেন, যা এমনকি উত্তম নীতি থেকেও উৎকৃষ্ট। তিনি এই আচরণকে সর্বোত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। কুরআনে অনেক আয়াতে আল্লাহ এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেনঃ

"আমার বান্দাদিগকে বল, তারা যেন সর্বোত্তম কথা বলে।" (সূরা আল ইসরাঃ ৫৩)

"নিকৃষ্টের জবাব উৎকৃষ্ট দিয়ে দাও।" (সূরা মু'মিনুনঃ ৯৬)

"সুকর্ম এবং দুষ্কর্ম সমান নয়। মন্দের মোকাবেলায় উত্তমটি কর; দেখবে, তোমার শত্রুও ঘনিষ্ট বন্ধুর মত হয়ে যাবে।" (সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৪)

যে সমাজে মানুষ কুরআনের নীতি মেনে চলে, সেই সমাজে প্রত্যেকে চেষ্টা করে "সর্বোত্তম আচরণ" করতে। এরকম সমাজে শান্তি এবং স্থিতি স্বাভাবিক জীবনধারায় পরিণত হয়। ক্রোধ, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, আক্রোশ স্রেফ দূরীভূত হয়ে যায়। বিশ্বাসীরা কখনো অমার্জিত আচরণের বশবর্তী হয় না। না পারিবারিক জীবনে, না ব্যবসায়-বাণিজ্যে, আর না যানজটের সময় উল্লেখিত অনাকাঙ্খিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেসবত্রুটিপূর্ণ আচরণ অন্যদের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয়, বিশ্বাসীদের নিকটে সেগুলি বিব্রতকর।

যখন ইসলামি নৈতিকতা একটি সমাজে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, তখন একটি শান্তিপূর্ণ আবহ বিরাজ করতে থাকে। অবস্থা যদি হয় বিপরীত, তাহলে মানুষ

অস্থিরতায় এবং সংকটে ভুগতে থাকে। ধর্ম পালন না করা কোন ব্যক্তিকে অনাকাঙ্খিত আচরণ থেকে বিরত রাখতে পারে– এমন একটি ব্যবস্থাও নেই। এ-ধরণের ব্যক্তি মনোভাব পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে– এটার সম্ভাবনাই বেশি । কারণ, সে নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে আচরণ করে; কোন এক অনাকাঙ্খিত মুহূর্তে সে স্রেফ রাগান্বিত হতে পারে, অন্যদের সঙ্গে অবমাননাকর আচরণ করতে পারে, কিংবা সহিংসও হতে পারে। আসলে আক্রোশের বশবর্তী হওয়াটা ব্যক্তিক বা সামাজিক অস্থিরতার সুস্পষ্ট লক্ষণ। ইতোপূর্বে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, এরকম অভিজ্ঞতা সচরাচর হয়ে থাকে দম্পতি, বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এমন লোক খুব অল্প আছে যারা সেই অবস্থায় বিরক্ত হয় না, যখন তারা ভাবে সবকিছু ঠিকমত চলছে না, যখন তারা মানসিক চাপ অনুভব করে, কিংবা তাদের স্বার্থ বিপন্ন হয়। এরকম সমাজে শান্তিতে বাস করা সত্যিই খুব কঠিন। এরকম সমাজের লোকেরা অন্যদের ভাবনা-চিন্তাকে বিবেচনায় নেয় না বললেই চলে। খুব অল্প লোকই উপলব্ধি করে, যার প্রতি সে রাগান্বিত সে অবসন্ন হতে পারে, নিদ্রাহীন হতে পারে, অসুস্থ হতে পারে, কিংবা তার কোন সমস্যা থাকতে পারে। মানুষ তো মানুষই, এবং তাদের প্রায়শঃ ভুল হয়ে থাকে। সামান্য একটা ভুলের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কাউকে অপমান করা, এমনকি তার সঙ্গে দন্দ্বে জড়ানোটা বোকামি। অথচ, অবিশ্বাসীদের সমাজে খাবার একটু বেশি সিদ্ধ হওয়া, শার্টে সামান্য দাগ লাগা, কিংবা রেস্তোরায় পরিবেশনে একটু দেরি– এসব বিবাদে লিপ্ত হবার কারণ হিসাবে যথেষ্ট। অপরপক্ষে, এসব সমাজের লোকেরা অবিচারমূলক আচরণের প্রতি স্রেফ উদাসীন থাকতে পারে, যদি এটা পরিণামে তার উপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।

ইসলামি নৈতিকতা ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার নিশ্চয়তা দেয়ঃ যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করে, তারা এটা স্বীকার করে নেয় যে, যা-কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব, তারা তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে। এই চেতনা তাদেরকে আত্মিক ভারসাম্য প্রদান করে। ভাল কি মন্দ– কোন ঘটনাই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণহীন করতে পারে না। তারা আকস্মিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে না। তাদের

আবেগ তাদেরকে ভ্রান্ত পথে চালিত করে না; এজন্যই তারা যে কোন পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে। একারণেই তারা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মানুষ হয়ে থাকে। বিশেষ করে, সংকটে বা দুঃসময়ে তারা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করে; তারা তাদের চারিপাশের মানুষের সম্ভাব্য বিপদ লাঘব করে। মানবতার প্রতি আল্লাহর দিকনির্দেশনা তথা আল কুরআনের নীতির দ্বারা নির্দেশিত হয়ে বিশ্বাসীরা তাদের আচরণ ও মনোভাবে কুরআনের নৈতিক আচরণ প্রতিফলিত করে। আল্লাহর নির্দেশনা যত্নসহকারে মান্য করায় এবং গভীর আল্লাহ-ভীতি থাকায় তাদের চেতনা এবং উপলব্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়ে থাকে। এভাবে তারা এমন চিন্তা এবং বিচারবুদ্ধির যোগ্যতা দ্বারা ভূষিত হয়, যা তাদের সর্বোত্তম আচরণ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের পথে চালিত করে।

নিঃসন্দেহে এসবগুণাবলী দ্বারা ভূষিত একজন বিশ্বাসী আতঙ্ক, দুঃখ, হতাশা বা বিষণ্নতায় ভোগে না। সে এমন সব ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয় না যা তার কাছে প্রতিকূল মনে হয়; সে সব সময় যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে। সে জটিল পরিস্থিতি এবং সঙ্কট মোকাবেলা করে এবং কখনোই হতোদ্যম হয় না। এমনকি জীবনের অতি কঠিন সময়েও সে মানুষের সাথে খুব ভদ্রভাবে কথা বলে এবং ধৈর্য্যশীলতা প্রদর্শন করে– এটি নির্ভরযোগ্য এবং পরিণত চরিত্রের লক্ষণ। যেহেতু তার অন্তরের অন্তস্থলে এই বিশ্বাস বর্তমান রয়েছে যে, যা-কিছু সংঘটিত হয় তা সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, সেহেতু একজন বিশ্বাসী সব সময় কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী স্মরণে রাখেঃ

“পৃথিবী বা তোমাদের উপরে যেসব বিপর্যয় ঘটে, তা ঘটার আগেই লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এই জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, তার জন্য উল্লসিত না হও আল্লাহ কোন দাম্ভিক ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।” (সূরা হাদীদঃ ২২-২৩)

যাহোক, যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করে না, তারা এই বাস্তবতা উপলব্ধি না করায় সব সময় উদ্বেগ, ভীতি, অস্থিরতা এবং দুর্দশা বোধ করে থাকে। মানসিক চাপ তাদেরকে মনস্তাত্ত্বিক এবং ভাবাবেগের দিক থেকে দুর্বল করে ফেলে। বাইরে থেকে

দেখলে কেউ এরকম লোকের মন-মেজাজকে অশান্ত মনে করবে। এরকম লোকের মনোভাবে সব সময় উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। যখন তাদেরকে সুখী মনে হয়, তখন তারা সহসা কান্নায় ভেঙে পড়তে পারে। কিসে তারা সুখী বা দুঃখী হবে, অধিকাংশ সময় সেটা ধারণা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। কখনো-বা তারা দুঃখের স্মৃতি স্মরণ করে এবং দুঃখিত হয়ে পড়ে। তারা সহজেই বিষণ্নতার শিকার হয় এবং একথা বলতে দ্বিধা করে না যে, তারা চরম বিষণ্নতায় ভুগছে। মাঝে মাঝেই তারা আত্মহত্যার কথা ভাবে, এমনকি সে-চেষ্টাও করে। এধরণের ব্যক্তির আচরণে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ভাল-মন্দ সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা থাকে না। কোন্ আচরণ যথার্থ, কোন্টা তা নয়; কোন্টা অর্থপূর্ণ আর কোন্টা অর্থহীন– এগুলি সম্পর্কেও তাদের ধারণা থাকে না। কারণ তারা সত্যধর্মের মানদণ্ডের ব্যাপারে অজ্ঞ।

তারা আল্লাহতে আস্থা স্থাপন করে না, কারণ ধর্মের ব্যাপারে তারা অনবহিত। তারা এই ব্যাপারে স্রেফ অসচেতন যে, যা-কিছু ঘটে, তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে; ভাল বা মন্দ যা-কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য হয়েছে। সত্যধর্মের মতাদর্শ অজানা থাকায় তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য তারা কখনো উপলব্ধি করে না। এজন্য তারা সেসব ঘটনাবলী সেভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না, যেভাবে করা উচিত। সমস্ত ঘটনাকে কাকতালীয় বিবেচনা করে তারা সব সময় নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ এবং দুর্দশার অনুভূতি লাভ করে। এজন্য তারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এবং অসঙ্গত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। পরে তারা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করে।

কোন বিষয়ে তারা সুস্থিত মানদণ্ড স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। যখন কোন কিছু তাদের পছন্দমাফিক হয়, তখন তারা অত্যন্ত খুশি এবং আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। হঠাৎ করেই তারা উদ্ধত হয়ে ওঠে। যখন তারা উৎফুল্ল হয়, তখন আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে; তারা অবমাননাকর এবং অমার্জিত আচরণ করে। তারা অপ্রত্যাশিত কাজ করতে পারে, আনন্দে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে পারে। আক্রোশ জন্মালে তারা রূঢ়ভাবে কথা বলতে পারে, কিংবা আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে।

যাহোক, এরকম আচার-ব্যবহার সমাজের কোন বিশেষ স্তরের কোন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেসবসমাজে ধর্মীয় নৈতিকতা বিদ্যমান নেই, সেখানে এমনকি সবচেয়ে পরিণত, শিক্ষিত এবং যুক্তিবাদী ব্যক্তিদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণ হারানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তারা তাদের প্রতিভার অপপ্রয়োগ করার মাধ্যমে মন্দ প্রভিপ্রায়ের বশবর্তী করে। যখন তারা উপলব্ধি করে যে, তাদের স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে কিংবা যখন সবকিছু তাদের ইচ্ছামাফিক না ঘটে, তখন এ-ধরণের ব্যক্তিদেরকে হীনকর্মের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি পেতে দেখা যায়।

যারা ধর্মের প্রতি নিবেদিত থাকে, তাদের চরিত্র হয় দৃঢ় এবং অবিচলঃ অজ্ঞ সমাজে যদিও ব্যক্তি-মানুষকে শক্তিমান মনে হয়, তবুও নিঃসন্দেহে তাদের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। কোন কোন পরিস্থিতিতে তারা তাদের দুর্বলতা ঢাকতে ব্যর্থ হয়। এমনকি যে ব্যক্তি কঠোর নীতিবান হিসাবে পরিচিত, সে-ও নিজের সুযোগ-সুবিধা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে নীতি বিসর্জন দেবার তাগিদ অনুভব করতে পারে । চাপের মুখে, সংকটে, জটিলতা বা অসুস্থতার সময়, কিংবা যখন তার মনে হয়, নিন্দা করার মত আশে পাশে কেউ নেই, তখন সে কোন নিয়ম বা সীমার তোয়াক্কা করে না। সে স্বেচ্ছায় আকর্ষণীয় প্রস্তাব গ্রহন করে, যেহেতু তার নীতি পরিত্যাগ ও নিজের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার না করার কোন সঙ্গত কারণ সে দেখতে পায় না।

তথাপি, ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেউ একজন অপকর্ম সংঘটিত করেছে কি-না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে ব্যক্তি ধর্মীয় মূল্যবোধের পরোয়া করে না (যা মানুষকে স্বার্থপর আকাঙ্খা পুরণ থেকে বিরত রাখে) তাকে অপকর্ম থেকে বাধা প্রদানের বা আটকানোর কোন উপায় থাকে না। আল্লাহর প্রতি কোন ভয় না থাকায় এই ধরণের লোকের নিজের ইচ্ছার উপর অবিচল থাকার মত মনেবলের অভাব থাকে।

তবে ইসলামি নৈতিকতার পূর্ণ উপলব্ধি যার রয়েছে, তার ব্যাপার আলাদা। সে যেটাকে সত্য মনে করে, তা সাধনের প্রত্যয় কেউ ভাঙতে পারে না। তার এই দৃঢ় প্রত্যয়ের মূল

কারণ হল তার গভীর আল্লাহভীতি। সে এই ব্যাপারে সচেতন যে, তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা সবকিছুই আল্লাহ শোনেন, দেখেন এবং জানেন। সে অনুভব করে, সব সময় সে আল্লাহর সামনে উপস্থিত। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছাশক্তি থাকে এবং নিখুঁতভাবে আল্লাহর নির্দেশিত সীমা মেনে চলে। সে কখনো এমন কিছু করার সাহস রাখে না, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। সে জীবনে কিসের সম্মুখীন হবে সেটা ব্যাপার নয়, সে আল্লাহর নিকটতর হবার এক প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে। এটি নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছেঃ

" . . কিছু লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, যাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং কেনা-বেচা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। যেন তারা যে কর্ম করে, সেজন্য আল্লাহ্‌ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং আপন অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি দেন। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা প্রদান করেন। " (সূরা আন নূরঃ ৩৬-৩৮)

ইসলামি নৈতিকতা স্বার্থপরতা দূর করেঃ এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, যারা ধর্মীয় নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে না, তারা কেবল নিজেদের কথাই ভাবে। এটা আসলে তাদের যাপিত জীবন-পদ্ধতির একটি দার্শনিক পূর্বশর্ত। ত্যাগ স্বীকার করার ইচ্ছা, করুণা, উত্তম নৈতিকতা হল এমন সব মূল্যবোধ যা কেবল ধর্মই শিক্ষা দেয়; ধর্মই কেবল নিশ্চয়তা দেয় যে, একজন এসব গুণাবলী লালন করবে। যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে এবং যারা এই ব্যাপারে সচেতন যে, তাদেরকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে, কেবল তারাই পারে কুরআনে বর্ণিত সেই নৈতিক শুদ্ধতা প্রদর্শন করতে। সেই কারণে একজন অবিশ্বাসীর জন্য মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া, একজন অবিশ্বাসীর একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল হবেঃ "এরকম স্বার্থপর মানুষ সমাজে আছে, কিন্তু আমি মোটেই তাদের মত নই।" কারণ, কেউ যদি ধর্মীয় মূল্যবোধ আঁকড়ে না ধরে, তাহলে তার স্বার্থপর না হয়ে কোন উপায় থাকে না। এর কারণ অন্যান্য ধরণের অনৈতিক মনোভঙ্গীর কারণ থেকে আলাদা নয়;

পরজীবনের প্রতি বিশ্বাসহীনতা, এই পৃথিবীর প্রতিটি অপকর্মের জন্য পরলোকে শাস্তি পেতে হবে– এই বিশ্বাস না থাকা এবং আল্লাহভীতি না থাকাই হল সেই কারণ।

এই কারণে, যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করে না, তারা কেবল নিজের সুবিধা অনুসরণ করে এবং অন্যদের পরোয়া করে না। তাদের জীবনের প্রধান প্রত্যাশা হল আরো বেশি বিত্তবান হওয়া, পেশাগত জীবনের উন্নয়ন ঘটানো, আরো উন্নত জীবনমান অর্জন . . . ঘনিষ্টদের প্রয়োজন পূরণ, অভাবগ্রস্তদের জন্য, দরিদ্র, বৃদ্ধ বা সমাজের কল্যাণে কিছু করা– এগুলি তাদের বিবেচনার তালিকায় শেষে রয়েছে। কারণ, অবিশ্বাসীদের জীবন মূল্যায়নে আত্মত্যাগের কিংবা উত্তম চরিত্রের অঙ্গীকারে প্রেরণার অভাব রয়েছে। যে সাধারণ মনোভাব সে চারিদিকে মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করে তা-ও ভিন্ন নয়; আসলে সমগ্র সমাজ কম-বেশি একই পন্থায় আচরণ করে। সমাজের সব মানুষের এই সাধারণ প্রবণতা বিবেকের জন্য এক রকম চেতনা নাশক তৈরি করে । সংক্ষেপে বলতে গেলে, যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে স্বার্থপরতা অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকে স্বার্থপর; কোন ব্যতিক্রম নেই।

যাহোক, মানুষকে এই স্বার্থপরতার অনুভূতির জন্য পরীক্ষা করা হয় যে অনুভূতি আল্লাহ তার অশোধিত সত্ত্বায় স্থাপন করেছেন। নিচের আয়াতে আল্লাহ মানুষের এই প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেনঃ

“. . . মানুষ লোভের জন্য স্বভাবতঃ কৃপন; যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে তোমরা যা কর, আল্লাহ তো তার খবর রাখেন।”(সূরা আন নিসাঃ ১২৮)

সাধারণভাবে স্বার্থপর মানুষ নিজের প্রত্যয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে (এমনকি তুচ্ছ ব্যাপার হলেও) জোরারোপ করে থাকে। তারা অন্যের প্রয়োজন বা চাহিদা খুব কমই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন স্বার্থপর লোক যদি অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্রাম চায়; পাশের বয়স্ক বা অসুস্থ লোকের কথা চিন্তাও করে না, যার বিশ্রাম আরো বেশি দরকার। অন্যদের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সে সবকিছুর

সবচেয়ে ভালোটা পাবার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। নিজের আরাম-আয়েশের জন্য অন্যের আরামে বিঘ্ন ঘটানো তাকে কখনো মনোকষ্ট দেয় না। সে নিজের কাজের সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দাবী করে; কিন্তু অন্যের কাজের সময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে না। পারিবারিক এবং ব্যবসায়িক জীবনে নানা উপায়ে তার স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়।

অবিশ্বাসীদের সমাজেও কিছু লোক থাকতে পারে যারা তাদের উত্তম চরিত্রের জন্য খ্যাত। উদাহরণ স্বরূপ, তারা তাদের নিকটস্থ লোকদের প্রতি খুব উদার হতে পারে। তবে তারা যে সৎকর্ম করে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নয়, বরং গুণী লোক হিসাবে খ্যাতি অর্জনের জন্য। প্রশংসিত হওয়া, মূল্যায়ন পাওয়া এবং মানুষের সমাজে সুখ্যাতি অর্জন হল তাদের লক্ষ্য। তাছাড়া, এসব লোক দরিদ্রদের জন্য যে অবদান রাখে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের আয়ের তুলনায় খুবই কম।

আদর্শবাদীদের দায়িত্ব বা নেতৃত্ব গ্রহণেরও আকাঙ্খা থাকে। আবারো বলতে হয়, তাদের লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন বা মানুষের সেবা করা নয়। তারা স্রেফ নিজের স্বার্থপর ইচ্ছা-আকাঙ্খার পিছনে ছুটতে থাকে সম্মান এবং খ্যাতি অর্জনের জন্য এবং সামাজিক অবস্থান উন্নত করার জন্য। অধিকাংশ সময় যখন তারা অনুভব করে যে, তাদের স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে, তখন তাদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায়।

যে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ অবহেলিত, সেখানকার উদার বলে পরিচিত ব্যক্তিদেরকে বিশ্বাসীদের ত্যাগ-তিতীক্ষার তুলনায় স্বার্থপর বলে মনে হবে। আত্মত্যাগের ধারণা বলতে বিশ্বাসীরা যা বোঝে, তা অবিশ্বাসীদের ধারণা থেকে বেশ পৃথক। বিশ্বাসীরা সব সময় নিজের প্রয়োজনের উপরে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়। মনের গভীরে তারা তাদের ভাই বা বোনের জন্য সবচেয়ে ভালটি কামনা করে। নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের নীতিকেই তুলে ধরেঃ

“খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীদেরকে খাবার দান করে।” (সূরা আল ইনসানঃ ৮)

এই নীতিবোধের কারণে বিশ্বাসীরা "আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে নির্যাতিত নারী-পুরুষ ও শিশুর জন্য।" (সূরা আন নিসাঃ ৭৫)

কেবল নিজেদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করার পরিবর্তে বিশ্বাসীরা প্রত্যেকের দায়িত্ব গ্রহন করে এবং সাধারণ কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। মহানবী (সাঃ)-এর বাণীঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, ততক্ষণ কেউ সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে" (বুখারী ও মুসলিম)। এই বাণী খুব চমৎকারভাবে বিশ্বাসীদের এই চেতনাকে তুলে ধরেছে।

যেখানেই ধর্মীয় মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ-তিতীক্ষার উপরে ভিত্তিশীল হয়ে থাকে এবং এভাবে অনেক সমস্যা নির্মূল হয়ে যায়।

ইসলামি নৈতিকতা জাগতিক উচ্চাকাঙ্খাকে নিরুৎসাহিত করেঃ কেবল ধর্মই সত্যিকার অর্থে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং সুখ-দুঃখের অংশীদার হবার ধারণা শিক্ষা দেয়। ধর্মই কেবল এসব ধারণাকে স্থায়িত্ব প্রদান করতে পারে। কারণ, মানবাত্মায় পার্থিব লোভ এবং স্বার্থপর আকাঙ্খার প্রবণতা আছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আস্থাহীন ব্যক্তিরা যেহেতু পারলৌকিক জীবনকে তাদের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করে না, সে-হেতু তারা সারাটা জীবনব্যাপী অসংখ্য উচ্চাশা পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যায়। আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে এই ধরণের মানুষের চিত্র এঁকেছেনঃ

"আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ, এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরেও সে কামনা করে যেন আমি তাকে আরো বেশি দিই।" (সূরা মুদাচ্ছির ঃ ১২-১৫)

যে পরিবেশে মানুষ ধর্মীয় নীতি অনুসারে জীবন যাপন করে না, সেখানে মানুষের উচ্চাশা হয়ে থাকে কেবল প্রচুর সম্পদ অর্জন। এরকম সমাজের মানুষের মধ্যে সব সময় তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেকেই হতে চায় সবচেয়ে সম্পদশালী,

সবচেয়ে সফল, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে প্রিয় বা জনপ্রিয়। তারা অন্যের ভাল বা সুন্দর হওয়াটা স্রেফ সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া, তারা অন্যদের ঈর্ষা করে এবং তাদের যা-কিছু আছে তা অর্জনের চেষ্টা করে। এমনকি অন্যকে তার মালিকানাধীন কিছু হারাতে দেখলে সে খুশি হয়।

এই লোভের সাথে জীবনের এক মৌলিক দর্শন এসে যায়; এসব লোক অন্যদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আত্মাবিশিষ্ট সত্ত্বা হিসাবে বিবেচনা করে না। বরং তারা অন্যদেরকে বানরসদৃশ জন্তু থেকে বিবর্তিত সাধারণ জন্তু বিবেচনা করে, যে জন্তু পরিণামে তুচ্ছ ধূলায় মিশে যাবে। এই একই যুক্তি অনুসারে, মানুষ যেহেতু একবারই বাঁচে, সেহেতু তাকে সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে ভালোটি লাভ করতে হবে। তার লক্ষ্য হবে তার উচ্চাশা পূরণে সচেষ্ট থাকা। এই বিকৃত ধারণা অনুসারে অন্যদের সাহায্য করা এবং তাদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা অর্থহীন। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে মানুষকে বিষণ্নতার দিকে ঠেলে দেয়।

এরকম মনোভাব সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে একেবারেই সাধারণ এবং অবশ্যম্ভাবী, যে ধর্মীয় নৈতিকতার ব্যাপারে অসচেতন। যাহোক, বাস্তবতা হল এই যে, এটা মানুষকে কঠিন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবনের দিকে ধাবিত করে; এটা মানবাত্মার জন্য হানিকর। এই কারণে অবিশ্বাসীরা কখনো সত্যিকার শান্তি এবং সুখ খুঁজে পায় না। আইনসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আশা-আকাঙ্খার কোন পরিসীমা নেই। কারণ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পারলৌকিক অনন্ত জীবনের একটি শক্তিশালী অংশ হিসাবে। এই জীবন আসলে মানুষের পরীক্ষার জন্য ভ্রান্তি এবং অপর্যাপ্ততা সহকারে বিশেষভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেন মানুষের আশা-আকাঙ্খা কখনোই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হয়। যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ না মানার কারণে পরীক্ষার এই অত্যাবশ্যকীয় রহস্যটি বুঝতে পারে না, তারা এই পৃথিবীতেই তাদের আকাঙ্খা পুরণের চেষ্টা করে এবং সেজন্য বারংবার অসন্তোষ এবং অতৃপ্তি বোধ করে থাকে। সত্যিকারের পরিতৃপ্তি কখনো অর্জিত না হওয়ায় তাদের জীবন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। সমৃদ্ধির মধ্যে থেকেও তারা দারিদ্রের যন্ত্রণা ভোগ করে। তারা যা অর্জন করেছে, তাতেই সন্তুষ্ট না থেকে যা এখনো করায়ত্ব

হয়নি তার জন্য সচেষ্ট থাকে। এই আত্মিক পীড়ন হল, এক অর্থে, চিরকালীন পীড়নের সূচনা মাত্র।

ধর্ম মানুষকে সুখ-দুঃখের অংশীদার হবার নির্দেশ দেয়। বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই-বোন (সূরা আত তাওবঃ ৭১) এবং এক ভাইয়ের কল্যাণ এবং সুন্দর কিছু অর্জন বিশ্বাসীদেরকে খুশী করে। যেহেতু প্রত্যেকেই নিজের দক্ষতা এবং সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সেহেতু বিশ্বাসীদের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতা এবং ভাগাভাগি করে নেবার স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকে যেহেতু স্বীকার করে নেয় যে, মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট জীব, সেহেতু তারা পরস্পরকে মূল্যায়ন করে এবং একে অপরের সঙ্গে সম্মানজনক এবং পরোপকারমূলক আচরণ করে থাকে। এমন এক সমাজে, সামাজিক অবিচার, সংগ্রাম এবং বিশৃঙ্খলার কথা কল্পনাও করা যায় না। "অর্থের প্রাচুর্য প্রকৃত সম্পদ নয়, বরং আত্মার প্রচুর্যই প্রকৃত সম্পদ" (বুখারী ও মুসলিম) মহানবী (সাঃ)-এর এই বাণী বিশ্বাসীদের অন্তরে শান্তির উৎসকে ব্যাখ্যা করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুসরণ হিংসা-বিদ্বেষ নির্মূল করেঃ এই গ্রন্থে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআনে হিংসা-বিদ্বেষকে অন্তরের অনৈতিক অবস্থা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কারণে বিশ্বাসীরা কঠোরভাবে ঈর্ষা বর্জন করে। ঈর্ষা এমন এক মানসিকতা যা আল্লাহর মর্জির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যে ব্যক্তি ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি মনোযোগী নয়, তার ঈর্ষাপরায়ণ না হবার কোন কারণ নেই। তার নিজের যুক্তিধারা অনুসারে এই মানসিকতা রোধ করার কোন প্রেষণা তার নেই। প্রতিযোগিতা মানুষকে ঈর্ষাপরায়ণ, স্বার্থপর এবং আবেগপ্রবণ হতে উদ্বুদ্ধ করে। একজন তরুণী তার চেয়ে বেশি ফ্যাশনদুরস্ত বা সুশ্রী তরুণীর প্রতি ঈর্ষা বোধ করে। তেমনিভাবে, একজন যুবক তার বন্ধুকে হিংসা করে এই জন্য যে, সে বেশি জনপ্রিয়। বয়স, লিঙ্গ, পেশা বা সামাজিক অবস্থান– কোন ক্ষেত্রেই এই অনুভূতির ব্যতিক্রম নেই। সমাজের সকল স্তরের মানুষই বিশেষ ধরণের হিংসা লালন করে। তারা বিশেষতঃ অন্যের সম্পদের প্রতি হিংসা বোধ করে। সম্মানজনক অঞ্চলে বসবাস, জনপ্রিয় গীষ্মকালীন অবকাশ

কেন্দ্রে অবকাশ যাপন, আনকোরা নতুন গাড়ি, বিদেশ ভ্রমণ– এগুলো হতে পারে অন্যের প্রতি হিংসা করার কয়েকটি কারণ। ঈর্ষা কিছু লোককে এত শক্তভাবে বেঁধে ফেলে যে, অন্যের কোন কৃতিত্ব বা অর্জনেও আনন্দ প্রকাশ করতে পারে না। বিশেষতঃ ব্যবসায়ের জগতে প্রতিদ্বন্দিতা মানবাত্মার যে ক্ষতি সাধন করে তা খুব স্পষ্ট। ব্যবসায় এর জগতে সম্মানজনক অবস্থান অর্জনের উচ্চাকাঙ্খা এবং এর পরিণতিতে সৃষ্ট হিংসা দৈনন্দিন জীবনের প্রায় স্বাভাবিক আচরণধারা।

কিন্তু আল কুরআন নিশ্চয়তা দেয় যে, বিশ্বাসীরা যে জীবন যাপন করে, তা স্বার্থপর আকাঙ্খা থেকে মুক্ত। বিশ্বাসীরা তাদের ভাইয়ের সফলতায় বা অর্জনে সন্তোষ বোধ করেঃ

". . (মুহাজিরদেরকে) যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য অন্তরে তারা আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি পরম দয়ালু এবং পরম করুণাময়।" (সূরা হাশরঃ ৯-১০)

আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে মহানবী (সাঃ)ও বিশ্বাসীদের হিংসা বর্জন করার উপদেশ দেনঃ "হিংসা বর্জন কর, কারণ হিংসা সেভাবে সৎকর্ম খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন জ্বালানী নিঃশ্বেষ করে দেয়।" (আবু দাউদ)

ইসলামি নৈতিকতা মানুষের মধ্যে ভালবাসা এবং সম্মান নিশ্চিত করেঃ সত্যের ধর্ম উত্তম নৈতিকতা এবং ভালবাসার উপরে ভিত্তিশীল। আল কুরআনে আল্লাহ মানুষকে ভালবাসতে এবং ত্যাগস্বীকার করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি

সদয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহর ভালবাসা আল কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:"তিনি চির ক্ষমাশীল এবং প্রেমময়।" (সূরা আল বুরুজ: ১৪)

আল্লাহর দাবী হল, মানুষ অন্যদের প্রতি এই ভালবাসার প্রতিফলন ঘটাক। এভাবে বিশ্বাসীরা পরস্পরের প্রতি গভীর সম্মান এবং ভালবাসা প্রদর্শন করে। এভাবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে– এটা এই ভালবাসা ও সম্মানকে উৎসাহিত করার আরেকটি কারণ। তাছাড়া, বিশ্বাসীরা জানে যে, আল্লাহর সৃষ্ট যে জীবের আত্মা ও বিশ্বাস আছে, সে মূল্যবান। পৃথিবী এমন এক স্থান, যেখানে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়– এই বিষয়টি বিশ্বাসীকে অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে প্রাণিত করে। কারণ, তারা জানে যে, তারা তাদের সদাচারের জন্য পরলোকে পুরস্কৃত হবে। তাদের অন্তরের গভীর আল্লাহ-ভীতি তাদেরকে অন্যের প্রতি সবচেয়ে ভাল আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তারা প্রতিটি প্রাণির মধ্যে আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতিফলন দেখতে পায়, যা তাদের অন্তরকে ভালবাসায় পূর্ণ করে দেয়। তাছাড়া, বিশ্বাসীদের জন্য পরজীবন অপেক্ষমান এবং সেখানে তারা সকলে মিলিত হবে– এই জ্ঞান তাদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং সম্মান আরো শক্তিশালী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করে।

এভাবে একটি উষ্ণ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন হল তাদের নিয়তি, যারা কঠোরভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে চলে। পারিবারিক সম্পর্ক উন্নততর হবে, শিশুরা মাতা-পিতা ও বয়স্কদেরকে সম্মান করবে। কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশও এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী দাবী করে:

"তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করবে না, মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করবে, তাদের একজন বা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে, তাদের উদ্দেশ্যে বিরক্তিভরে 'উহ' পর্যন্ত বলবে না এবং তাদের প্রতি কটূবাক্য উচ্চারণ করবে না; বরং তাদের সঙ্গে কথা বলবে নম্রতা ও উদারতার সঙ্গে।" (সূরা আল ইসরা:২৩)

মহানবী (সাঃ)ও এই বিষয়ের উপরে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেনঃ "যারা আমাদের ছোটদের প্রতি করুণা করে না এবং বয়োঃজেষ্ঠ্যদের সম্মান করে না, উত্তম জিনিসের সুপারিশ করে না এবং গর্হিত জিনিস প্রতিরোধ করে না, তারা আমাদের দলভূক্ত নয়।" (তিরমিযী)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে এভাবে উপদেশ দিচ্ছেনঃ

"আল্লাহর উপাসনা কর, কোন কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরিক ক'রো না, এবং সদ্ব্যবহার কর আপন মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, গরীব, নিকটবর্তী প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশীর সঙ্গে, সঙ্গী-সাথী, পথিক এবং তোমাদের অধিকারভূক্তদের (দাস-দাসী) সঙ্গে; নিশ্চয় আল্লাহ্ অহংকারীকে ভালবাসেন না।" (সূরা নিসাঃ ৩৬)

যখন ধর্মের নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন মানুষ আচরণ এবং কথাবার্তার ধরণ উন্নত করার জন্য একে অপরের সাথে সাগ্রহে প্রতিযোগিতা করে । কোন সন্দেহ নেই, কেবল ধর্মই এরকম নৈতিকতা নিশ্চিত করেঃ

"তুমি কি ভেবে দেখ না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দেন? কালেমা তাইয়েবার তুলনা হল উত্তম বৃক্ষ, যার মূল দৃঢ়, যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে উত্থিত। সেই বৃক্ষ আপন প্রতিপালকের ইচ্ছা অনুসারে ফল প্রদান করে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যেন তারা শিক্ষা গ্রহন করে।" (সূরা ইবরাহীমঃ ২৪-২৫)

যেসব লোক আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলে, তারা বন্ধুত্বের, ভালবাসা ও সম্মানের শ্রেষ্ঠ নজির স্থাপন করে। এটি হল বিশুদ্ধ ভালবাসা যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর সব স্বার্থচিন্তা থেকে মুক্ত।

"সত্যিকারের বিশ্বাসী নারী-পুরুষ একে অপরের বন্ধু । তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে; এদের প্রতিই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আত তাওবাঃ ৭১)

উল্লেখিত আয়াতে অঙ্কিত বন্ধুত্বের চিত্র সামগ্রিকভাবে এক অবিভাজ্য সামাজিক ঐক্য নিশ্চিত করে, যা সমাজের প্রতিটি সদস্য তীব্রভাবে অনুভব করে থাকে। এই ধরণের লোক তার ভাইয়ের জন্য সবচেয়ে ভালোটি কামনা করে থাকে। যে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসৃত হয় না, সেখানে মানুষ কখনো সত্যিকারের ভালবাসার অভিজ্ঞতা পায় না। কারণ, তাদের ভালবাসা ও সম্মানের বস্তু হল সুন্দর চেহারা, সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থান।

বন্ধুত্বের বন্ধন বন্ধু নির্বাচনকারী ব্যক্তির ফ্যাসনপ্রিয়তা, সুন্দর চেহারার প্রতি আকর্ষণ– এসব মূল্যবোধের উপরে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত। বিবাহের ক্ষেত্রেও এই ধরণের মানসিকতার নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, বিশ্বাসহীন সমাজে, একজন ব্যক্তির কোন নারীকে বিবাহ করা প্রায়শঃ নির্ভর করে সুন্দর চেহারার উপর, কিংবা সমাজে সম্মানজনক অবস্থানের উপর। এটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, লোকটি তার স্ত্রীকে আর ভালবাসবে না যদি তার চেহারা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে, কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ে, উদাহরণ স্বরূপ, পঙ্গু হয়ে যায়। তাছাড়া, যে ব্যক্তির পারলৌকিক জীবনে আস্থা নেই, সে তার সংক্ষিপ্ত জীবনটাকে শয্যাগত নারীর পরিচর্যায় "অপচয়" করতে চাইবে না। সমাজে এই ধরণের দৃষ্টান্ত প্রচুর।

সম্মান ভালবাসার মতই গুরুত্বপূর্ণ। একভাবে বলতে গেলে, একজন অপরকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে– এটা তার বহিঃপ্রকাশ। যেসব সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ অবহেলিত, সেখানে অন্যকে সম্মান করার জন্য কিছু মানদণ্ড প্রয়োজন পড়ে। অধিকাংশ সময় এই মানদণ্ড হল অর্থ-সম্পদ, সামাজিক অবস্থান এবং ক্ষমতা। এসব শর্তের অনুপস্থিতিতে, তারা তাদের মত অন্য মানুষকে সম্মান করার কোন কারণ খুঁজে পায় না। পক্ষান্তরে, তারা ক্ষমতাহীন বা সামাজিক অবস্থানহীন লোকের প্রতি তাদের সম্মান হারিয়ে বসে।

ইসলামি নৈতিকতা সত্যিকারের বন্ধুত্ব শিক্ষা দেয়ঃ ধর্ম-বিবর্জিত সমাজে আপনি নিশ্চয় মানুষকে এমনটি বলতে শুনে থাকবেনঃ "আমার অনেক বন্ধু আছে, কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু একটিও নেই", কিংবা "আমি আমার কোন বন্ধুকে বিশ্বাস করি না"।

আপাত দৃষ্টিতে খুব ঘনিষ্ট বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও এসব লোক মনের গভীরে অনুভব করে যে, তারা বান্ধবহীন। তাছাড়া, তারা নির্ভরযোগ্য বন্ধু পাবে– সেই সম্ভাবনাও খুব কম। এই বাস্তবতা জানার কারণে এসব লোক সত্যিকারের বন্ধু গড়ে তোলার চেষ্টা করে না। কারণ, সত্যিকারের বন্ধুত্ব ত্যাগ এবং প্রচেষ্টা দাবী করে। সংকটের সময় বন্ধুর জন্য ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। কোন দ্বিধা ছাড়াই বন্ধুর প্রয়োজনে সময়, অর্থ, কিংবা যা-কিছু মূল্যবান বোধ হয়, তা ব্যয় করা উচিত। অথচ, যে সমাজে ধর্মহীনতা বিদ্যমান, সেখানে মানুষ ত্যাগ স্বীকার করা অর্থহীন মনে করে।

উদাহরণ স্বরূপ, কেউ যদি আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া, তার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করা, কিংবা হাসপাতালে থেকে তার সেবা করাটা ঝামেলা মনে করবে। এই সম্ভাবনাও আছে যে, বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য তার সঙ্গে থাকার পরিবর্তে সে কাজে যাবার, বিদ্যালয়ে যাবার, কিংবা পরিবারের সঙ্গে থাকার অজুহাত দেখাবে। মজার ব্যাপার হল, প্রত্যেকে এটাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী মনে করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি অমনোযোগী লোকের সত্যিকারের বন্ধু না থাকার এটাই হল মূল কারণ। এমনকি তাদের স্বামী বা স্ত্রীও বিশ্বাসী নয়ঃ ভালবাসা এবং সম্মান অল্প সময়ের মধ্যেই হারিয়ে যায়। অনেক বছরব্যাপী তারা পরস্পরকে সহ্য করে অর্থনৈতিক কারণে, সামাজিক চাপের কারণে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে। এরকম পরিস্থিতিতে, তারা তাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য তাদের সন্তানের উপর নির্ভর করে। এ এক বৃথা প্রয়াশ, কারণ, সন্তানরাও তাদের নিজস্ব জীবন যাপন করে। পার্থিব লোভ এবং স্বার্থপরতা কবলিত হয়ে, তারা প্রায়শঃ তাদের মাতা-পিতাকে কোন সাহায্য করে না। ফলতঃ ধর্মহীন জীবন যাপনকারী ব্যক্তিদের নিয়তি হল, এই পৃথিবীতে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে; এটা তাদের মনোভঙ্গীর এক স্বাভাবিক পরিণতি।

ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ সব রকম জাগতিক ভীতি দূর করেঃ আল্লাহর দলভূক্ত না হওয়ায় এবং আল্লাহর উপর আস্থাশীল না হওয়ায়, ধর্মীয় নৈতিকতা বর্জিত লোকেরা অনিবার্যভাবে ভিত্তিহীন ভীতি লালন করে। তারা সব সময় ভবিষ্যতের ভয়, নিঃসঙ্গ হয়ে যাবার ভয়, সম্পদ এবং স্বাস্থ্য হারাবার ভয়ে ভীত থাকে। তারা দুর্ঘটনাকে খুব ভয় পায়, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তারা মৃত্যুকে ভয় পায়।

"বল, যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করতে চাও, তা একদিন তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। তারপর দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞান যিনি রাখেন, তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা তোমরা করতে।" (সূরা আল জুমুআঃ ৮)

অবিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যু নিঃসন্দেহে এক রহস্য। যদিও তারা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে ভাবে না, তবুও তারা গভীরভাবে চিন্তা করে, তারা কিভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। তারা এই অনুভূতির কবল থেকে মুক্তি পায় না। তারা সব রকম মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করে এবং খুব আতঙ্কিত বোধ করে, একদিন কোন না কোন প্রকার মৃত্যু তাদের উপরে এসে পড়বে। পরলোকের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস না থাকায় তাদের কাছে মৃত্যু খুব আতঙ্কজনক। তারা ভাবে, তারা মাটির নিচে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে থাকবে; পুনরায় জীবন ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের মৃত্যুভীতি মূলতঃ আবর্তিত হয় পার্থিব আনন্দ হারানো এবং বিচার দিবসের বাস্তবতা মেনে নেবার চেয়ে অস্তিত্বহীন হওয়ার চিন্তায়।

মানুষ প্রধানত পিছনে স্মৃতিসৌধ রেখে যাবার মাধ্যমে মাটিতে বিলীন হয়ে যাবার অনুভূতি জয় করতে চেষ্টা করে । এই মনোভাব কুরআনের একটি আয়াতে বিধৃত হয়েছেঃ

"তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ যেন তোমরা চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা শুআ'রাঃ ১২৯)

মৃত্যুর উল্লেখমাত্র অবিশ্বাসীদেরকে দুর্ভাবনায় ফেলে দেয়। তারা এই চিন্তা এড়ানোর জন্য যত কঠিন চেষ্টাই করুক, প্রতিদিন তারা খবরের কাগজে এবং টেলিভিশনে মৃত্যুর দৃশ্য দেখে থাকে। চারিদিকে লোকজনের মৃত্যু, দুর্ঘটনা কিংবা অসুস্থতা তাদেরকে সব

সময় এই জীবনের সমাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এটা এড়িয়ে চলাই তাদের সাধারণ প্রবণতা; তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে মৃত্যুচিন্তা না করতে। কেউ যদি কখনো মৃত্যুর আলোচনা করতে চেষ্টা করে, তারা তার মনোযোগ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে এবং তাকে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভুলিয়ে দেয়।

মৃত্যু নানা রূপে আসতে পারে– এই চিন্তা তাদেরকে আতঙ্কিত করে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা কবরস্থান দেখতে চায় না, তারা কবরস্থান সংলগ্ন বাড়ি কিনতে চায় না, যেন তারা মৃত্যুচিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তবে পৃথিবীর যে প্রান্তেই তারা থাক, একদিন মৃত্যু তাদের নাগাল পেয়ে যাবে। এই অনিবার্য বাস্তবতা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছেঃ "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে, এমনকি দুর্গম দুর্গে অবস্থান করলেও।" (সূরা আন নিসাঃ ৭৮)

মৃত্যু এবং পরলোক এমন দুটি বাস্তবতা যে ব্যাপারে বিশ্বাসীদের পরিস্কার ধারণা রয়েছে। তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করে এটার প্রতীক্ষায়। তাদের জন্য মৃত্যু হল আশীর্বাদ; এটার মাধ্যমে তারা তাদের স্রষ্টার সান্নিধ্যে এবং সত্যিকারের আবাসে পৌঁছে যায়। তারা জানে যে, মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয়। এজন্য তারা না মৃত্যু, আর না অন্য কিছুকে ভয় পায়।

ধর্মের আনুগত্য ভবিষ্যতের ভীতি দূর করেঃ বিশ্বাসীরা ছাড়া প্রায় সব লোক তাদের ভবিষ্যতে কি আছে তা নিয়ে উৎসুক। তাদের জীবনে ঘটতে পারে– এমন সব প্রতিকূলতা বিবেচনা করে তারা উৎকণ্ঠা বোধ করে। ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা আছে এমন সব অনাকাঙ্খিত ঘটনার চিন্তা তাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয় এবং উদ্বিগ্ন করে। এসবস্থায়ী ভীতি ছাড়াও বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন উৎকণ্ঠা তাদের জীবনে দেখা দেয়। একজন ছাত্রের জন্য এই উৎকণ্ঠার কারণ হতে পারে টার্ম পেপারের মত সাধারণ ব্যাপার, যেজন্য তার হাতে খুব অল্প সময় আছে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ নিজের জন্য নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি করে; এসবজটিলতার ভীতি আজীবন থাকতে পারে।

একটি অল্প বয়স্ক হাইস্কুল পড়ুয়া বালকের কাছে তার চেহারা, বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক, পরিচিত মহলে তার জনপ্রিয়তা, পড়ালেখায় সফলতা এবং তার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক– এসবই পৃথিবীর অতি গুরুতর সমস্যা বলে প্রতীয়মান হয়। একটা সামান্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তার বড় মনোকষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, পেশা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় মনে হয়, এটাই বুঝি সবচেয়ে কঠিন সময়। বলাবাহুল্য, এগুলো এমন সব ঘটনা, যা নিয়ে কারো এত বেশি বিপর্যস্ত হওয়া উচিত নয়। অবশ্যই এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, একজন সেই পেশা নির্বাচন করবে, যাতে সে সফল এবং সুখী হবে বলে বিশ্বাস করে। তবে কেউ যদি এরকম লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও বিফল হয়, তখন তার উচিত আল্লাহর উপরে আস্থা রাখা এবং অন্য কোন অনুগ্রহের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। সন্দেহ নেই, সফলতা, বিফলতা সবই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাবে। যা হারায় না তা হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা।

যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসারে জীবন যাপন করে না, তারা এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উপলব্ধি করে না; তারা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আরো বেশি ভীতিগ্রস্ত হতে থাকে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা বাদ দিলেও, দৈনন্দিন অনেক দায়িত্ব এবং কর্মকাণ্ড তাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। অসংখ্য ঝামেলা তাদেরকে বেষ্টন করে থাকে। কালে বিভিন্ন চিন্তা তাদেরকে পেয়ে বসে। যেমন, তারা কি কোম্পানিতে পদোন্নতি পাবে? গ্রীষ্মে তারা কি ছুটি কাটাতে যাবে? তারা কোথায় ছুটি কাটাবে? তারা আরো ভাল বাড়িতে উঠতে পারবে কি? সময়মত তারা সভায় উপস্থিত হতে পারবে কি?

প্রধানতঃ আর্থিক অবস্থার অবনতির ভয় তাদেরকে তাড়িত করে। ভবিষ্যতে তারা পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে কি-না এই চিন্তা তাদেরকে খুবই উদ্বিগ্ন করে। তাদের অনেক বড় জাগতিক উচ্চাশা রয়েছে, অথচ তা অর্জনের উপকরণ সীমিত। এটা তাদের ভয়ের এক বড় উৎস। এটার কারণে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপনের মত পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা অপরের কল্যাণে তা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে। ধনী হোক বা দরিদ্র, তারা সবাই ভবিষ্যতের ভয় করে এবং হীন আচরণ করে। কিন্তু

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে এই পৃথিবীতে প্রতিপালন করেন; তারা কখনোই সংকটে পড়বে না যদি তারা আল্লাহর উপরে আস্থা রাখে। তারা যেহেতু আল্লাহর উপরে আস্থা রেখে নিরাপদ বোধ করে না, সেহেতু তারা এরকম স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ মানুষকে যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য তাকে পরীক্ষা করা হয় এবং এসবঅনুগ্রহ আল্লাহর পথে ব্যবহার করা তার দায়িত্ব। তবে ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কার কারণে অধিকাংশ লোক নিজের লাভের ভাবনা দ্বারা তাড়িত হয়। এই অবস্থা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও করুণার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।" (সূরা আল বাকারাঃ ২৬৮)

ভবিষ্যত নিয়ে মানুষের আরেক চিরন্তন ভীতি হল ক্রমশঃ এগিয়ে আসা বার্ধক্য। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সে নিজের দেহে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকে; মুখে বলিরেখা পড়তে শুরু করে, চুল পড়ে যেতে থাকে এবং পাকতে শুরু করে, ইন্দ্রিয়গুলি সংবেদশীলতা হারাতে থাকে। যারা ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি সচেতন নয়, তাদেরকে বার্ধক্যের প্রতিটা লক্ষণ আতঙ্কিত করে তোলে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা ভেবে আকুল হয়, তাদের সন্তান তাদের দেখাশোনা করবে কি-না। একদিন মৃত্যু এসে পড়লে কিভাবে তার মুখোমুখি হবে– এটাও শঙ্কার এক কারণ। বার্ধক্যের আরেক উদ্বেগের বিষয় হল, তাদের স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। জীবনসঙ্গীর অনুপস্থিতিতে তারা কিভাবে সবকিছু সামলাবে– এটা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন থাকে।

বিশ্বাসহীনতার কারণে মানুষ এসব ভয় এবং সংকটের আশঙ্কায় অবশ্যই ভুগে থাকে।। বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে অবশ্য পরিস্থিতি ভিন্ন। তাদের এসব ভীতি নেই। তারা বিশ্বাস করে, সব কিছুতেই কল্যাণ রয়েছে। কারণ, যা-কিছু ঘটে, তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণেই ঘটে। তারা আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশা করে না। কারণ, কেবল আল্লাহকেই তারা রক্ষাকর্তা বলে মানে। তাছাড়া, এই ব্যাপারে তারা সচেতন যে, এই জগতে তাদের ভয় পাবার কিছু নেই। তাদেরকে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে

এবং সব সময় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বাসীদের এই দৃষ্টিভঙ্গী কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ "বল, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, তা ভিন্ন কিছুই ঘটতে পারে না। আল্লাহর উপরেই বিশ্বাসীদের আস্থা স্থাপন করা উচিত।" (সূরা আত তাওবাঃ ৫১)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি বাণীতেও বিশ্বাসীদের আত্ম-নিবেদনের বিষয়টি জোরালোভাবে উল্লেখিত হয়েছেঃ

"তোমরা যদি আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনিও তোমাদেরকে স্মরণ করবেন। আর তোমরা যদি আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে তাঁকে তোমাদের নিকটেই পাবে। যখন তোমরা কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর নিকট চাইবে; যদি সাহায্য চাও, তবে তাঁরই নিকট চাইবে। জেনে রেখ, যদি সকল মানুষ একত্র হয়েও তোমার উপকার করতে চায়, তবুও আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ভিন্ন তারা কিছুই করতে পারবে না । তারা সকলে একত্র হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলেও তারা ততটাই ক্ষতি করতে পারবে, যতটা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গেছে। (তিরমিযী)

যখন কেউ ইসলামি বিধান অনুসারে নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন যাপন করে, তখন অনেক সঙ্কট এবং দুর্ভোগ স্বাভাবিকভাবে দূর হয়ে যায়; প্রত্যেকে সুখী এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। ধর্ম সকল সমস্যার সমাধান দেয়; মানুষ স্বাধীন এবং ভারমুক্ত বোধ করে। কারণ, তারা এই ভেবে স্বস্তি বোধ করে যে, তাদের জীবনে ঘটা প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। সঙ্কটের সময় তারা কখনো ভুলে যায় না যে, আল্লাহর উপরে আস্থা রাখার কারণে তারা পুরস্কৃত হবে। তেমনিভাবে, তারা যখন কোন অনুগ্রহ লাভ করে, তখন তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে। এভাবেও তারা পরলোকে পুরস্কৃত হবার আশা রাখে। আত্মার এই পরিতৃপ্তি এমন এক সুযোগ, যা ইসলামি নৈতিকতা বিশ্বাসীদেরকে প্রদান করেছে। কিন্তু এই অনুগ্রহ উপভোগ করার জন্য আল্লাহর প্রতি মজবুত বিশ্বাস এবং আনুগত্য অত্যাবশ্যক। কেবল তারাই উৎকণ্ঠামুক্ত থাকতে পারে, যাদের মজবুত বিশ্বাস রয়েছে। পক্ষান্তরে, অন্যেরা উদ্বেগ এবং ভীতির

দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং এই পার্থিব জীবনে থাকা কালীনই শাস্তি ভোগ করা শুরু করে।

ইসলামি নৈতিকতা বিশ্বাসীদেরকে বিনয়ী করেঃ আল কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ মানুষকে বিনয়ী হতে নির্দেশ দিচ্ছেন; তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি উদ্ধত ব্যক্তিদের প্রতি অসন্তুষ্ট। ফলে, একজন বিশ্বাসী বিনয়ী না হয়ে পারে না।

ধর্মীয় নীতিমালা অনুযায়ী যারা জীবন যাপন না করে, তাদের মধ্যে বিনয় আশা করা অর্থহীন। ব্যক্তিগত ইতিবাচক গুণাবলী যেমন বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ, সুন্দর চেহারা এবং খ্যাতি নিয়ে এই ধরণের ব্যক্তিরা গর্ববোধ করে; এই কারণে তারা অন্যদের প্রতি উদ্ধত ঘৃণা বোধ করে থাকে। তারা সব সময় আকর্ষণীয়, ভিন্ন এবং বুদ্ধিমান হওয়ার মাধ্যমে পরিচিত মহলে শ্রেষ্ঠত্ব চায়। ইতোমধ্যে, তাদের মনে কখনো এই চিন্তার উদয় হয় না যে, একদিন তাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। আশা-আকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে তারা যা কিছু অর্জন করেছে, তা সবই হারিয়ে বসবে। যে দৈহিক শক্তি বা সৌন্দর্যের কারণে তারা এত উদ্ধত, তা পঁচে গলে মাটিতে মিশে যাবে। তারা আসলে যার মূল্যায়ন করে তা হল অহঙ্কার। তাদের কাছে অহঙ্কার অনেকটা ব্যক্তিত্বের চিহ্ন স্বরূপ।

অহঙ্কার তাদেরকে মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা এবং সম্মান প্রদর্শন করতে বাধা দেয়। কারণ, এটাও তাদের গর্বের বিষয়। তারা অন্যদের নিকট থেকে সম্মান এবং ভালবাসা পাবার আশা রাখে, কিন্তু তারা ভাবে, এর প্রতিদান দিলে তাদেরকে বোকা বোকা দেখাবে।

যেসব লোক ইসলামি নীতির বন্ধনে আবদ্ধ নয়, তারা অহঙ্কারী হয়ে থাকে। তাদের ধারণা, তারা সব জানে; তারা অন্যদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে অপদস্ত করার প্রত্যেকটা সুযোগ গ্রহন করে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এরকম লোক

সমাজে নেহায়েত কম নয়। যে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিদ্যমান নেই, সেখানে অনেক লোকই এই চরিত্রের হয়ে থাকে।

আল কুরআনে ঔদ্ধত্যের জন্য এক আচরণগত মানদণ্ড স্থাপন করা হয়েছে।

"জমিনের বুকে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। তুমি পদভারে না পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে, আর না পাহাড়ের উচ্চতায় উঠতে পারবে।" (সূরা আল ইসরাঃ ৩৭)

অন্য এক আয়াতে বলা হচ্ছেঃ

"তুমি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে মানুষের সঙ্গে অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করো না এবং পৃথিবীর বুকে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। আল্লাহ অহংকারী এবং উদ্ধত ব্যক্তিকে ভালবাসেন না।" (সূরা লুকমানঃ ১৮)

মহানবী (সাঃ)ও বিশ্বাসীদেরকে ধৃষ্টতার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেনঃ

"সে মন্দ লোক, যে অহংকারী এবং গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুমহান সত্ত্বাকে ভুলে যায়।" (মুসলিম)

কিছু লোক নিজেদেরকে একথা বলে প্রতারিত করতে পারেঃ "আমি বিনয়ী।" তবে, ইসলামি নৈতিকতার বিষয় হিসাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের উপরে এবং সমগ্র আচরণের উপরে বিনয়ের প্রভাব রয়েছে। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে বিনয়ী, সে এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সেই পরম সত্ত্বা আল্লাহর নিকট ঋণী, যিনি তাকেসহ তার আয়ত্বে থাকা সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুর মালিক। যা-কিছু ঘটে, তা আল্লাহর জ্ঞাতসারে ঘটে– এই ব্যাপারে সে সচেতন থাকে। এই ধরণের লোক বিশ্বাসী না হয়ে পারে না। ধর্মীয় জ্ঞান বিবর্জিত একজন ব্যক্তির সত্যিকার অর্থে আচরণে বিনয়ী হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ তার নৈতিকতার উপলব্ধি এবং বিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গী নেই। যদি সে কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে জীবন যাপন না করে, তাহলে তার প্রদর্শিত বিনয় ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়, অথবা তার আচরণ হীনম্মন্যতাবোধের ফল।

এটা স্পষ্ট, যে সমাজে উদ্ধত ব্যক্তির সংখ্যা বেশি থাকে, সেই সমাজ অসহনীয় এবং সমস্যা ও মনোকষ্টের উৎস মাত্র হয়ে থাকে। যে সমাজের সদস্যরা ঔদ্ধত্যের কোন সীমা পরিসীমা মানে না, নিষ্ঠুর এবং আত্মগর্বী হয়ে থাকে, এবং যে সমাজের সদস্যরা কোমল স্বভাবের এবং বিনয়ী, তাদের মধ্যকার ব্যবধান বিস্তর। যেসব লোক ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে, তারাই এই পার্থক্যের কারণ।

ইসলামি নৈতিকতা সমাজকে নির্দয়তা ও স্নেহহীনতা থেকে মুক্ত করেঃ সহানুভূতি হল আল্লাহর এক গুণ এবং তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে এই গুণ প্রত্যাশা করেন। আল কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সহানুভূতিশীল হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও বিশ্বাসীদেরকে সদয় হবার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেনঃ "যারা দয়া প্রদর্শন করে, তারা পরম দয়ালু আল্লাহর দয়া লাভ করে। তুমি যদি পৃথিবীবাসীর প্রতি করুণা কর, তাহলে আসমানবাসী তোমার প্রতি সদয় হবেন।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন বা ইসলামি নীতি অনুসারে জীবন যাপনে নিবেদিতপ্রাণ না হলে মানুষ নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবে। অবিশ্বাসীদের সমাজে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহানুভূতির অভাব লক্ষ্য করা যায়। একজন অবিশ্বাসী তার অতি নিকটাত্মীয়, যেমন মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সহানুভূতিহীন আচরণ করতে পারে। সে সহজেই অন্যের ভুলের জন্য রুষ্ট হতে পারে এবং তাদেরকে কষ্ট দিতে পারে। অনেক আচরণই তাদের রাগান্বিত হবার কারণ হতে পারে; তারা কোন ঘটনাকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে না।

বিশ্বাসহীন ব্যক্তি কখনো দরিদ্র কিংবা প্রতিবন্ধীদের প্রতি করুণা করে না। কারণ, তার কাছে আসন্ন স্বার্থ কিংবা দৈনন্দিন প্রয়োজন অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাবনা তাকে অন্যদের কথা ভাবতে বাধা দেয়। সন্দেহ নেই, এই ধরণের লোক সহানুভুতিকে তার নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে। তবে সেটা বিকৃত ব্যাখ্যা। উদাহরণ

স্বরূপ, সে ভিক্ষুকদের জন্য করুণা বোধ করে এবং এটাকে সহানুভূতি প্রদর্শনের এক বড় উপায় বলে মনে করে। তবে পরিস্থিতি যখন সত্যিকারের বিবেকবানের মত সিদ্ধান্ত, আচরণ এবং আত্মত্যাগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দাবী করে, তখন সে স্রেফ অবিবেচকের মত নির্বিকার থাকে যেন তার নিজের স্বার্থ ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে। উহাহরণ স্বরূপ, সে যদি এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, তাহলে সে সাহায্যের জন্য থামে না। সে এর জন্য অসংখ্য অজুহাত দাঁড় করায়। মোটের উপর, আহত লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার দিনটাই মাটি হবে, এবং হয়ত তার টাকা এবং সময় ব্যয় করতে হবে। তাছাড়া, অপরিচিত কারো জন্য ঝামেলায় জড়ানো কিংবা ত্যাগ স্বীকার করার কোন অর্থ হয় না। মোট কথা, তার ত্যাগের কোন বিনিময় তো সে পাবে না।

যে সমাজে ধর্মীয় নীতিমালা মেনে চলা হয় না, সেখানে এই ধরণের ঘটনা প্রচুর ঘটে থাকে। মানুষ যখন ধর্মীয় বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলে, তখন এসব অমানবিক কর্ম লোপ পায় বা দূরীভূত হয়। কেবল ধর্মই এমন আশীর্বাদপুষ্ট পরিবেশ নিশ্চিত করে, যেখানে মানুষ একে অপরের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতি বোধ করে এবং শোভন আচরণ করতে আগ্রহী থাকে। তবে, এই ব্যাপারে জোর দেওয়া উচিত যে, অল্প কিছু লোকের নৈতিক গুণাবলী অর্জন যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, আল কুরআনের নীতিমালা অনুসরণের ক্ষেত্রে একজন বিশেষ কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। অন্যেরা সেই পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে, কিংবা নীতির কারণে কিছু মন্দ কাজ বর্জন করে, আবার ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কিছু মন্দ কাজ করে থাকে। এরকম অবস্থাও কাঙ্খিত পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সত্যিকারের শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনের অস্তিত্ব তখনই সম্ভব, যখন লোকেরা সম্মিলিতভাবে ইলাহী ধর্মের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে এবং অটলভাবে আত্মত্যাগী দৃষ্টিভঙ্গী লালন করে।

ইসলামি নৈতিকতা নিশ্চিত করে যে, প্রত্যেকেই সমাধান দেবেঃ যে ব্যক্তি কুরআনের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে, সে বিজ্ঞের মত আচরণ করে এবং নানা সমস্যার সমাধান করে। এভাবে , কুরআনের নীতি অনুসারে জীবন যাপনকারী কোন

ব্যক্তি কখনো হতাশা বোধ করে না, পরিস্থিতি যতই জটিল মনে হোক। এই কারণেই ধর্মীয় বিধান অনুসরণকারী সমাজে কোন ব্যক্তিই কখনো এমন কোন জটিলতার সম্মুখীন হয় না, যা সে জয় করতে অক্ষম।

যখন ধর্মীয় নৈতিকতা বিরাজমান না থাকে, তখন মানুষ তেমন প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারে না, যেমনটি দেওয়া উচিত। সেজন্য ধর্মহীন সমাজে সাধারণ সমস্যাও সমাধান না হয়ে পড়ে থাকে। আসলে সমস্যা এবং সংকটই হল এরকম সমাজের লোকদের সমস্ত জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য উত্তম সমাধান খুঁজে বের করার পরিবর্তে তারা দৈনন্দিন জীবনের সাথে সমস্যাগুলো একীভূত করে নেয়, যেন তারা সমাধানহীন থাকবে– এটাই নিয়তি। যারা ধর্ম থেকে দূরে অবস্থান করে, তারা সমস্যাবলীর সমাধানে অদক্ষ হওয়ায় এটার প্রতিক্রিয়া তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পড়ে । প্রধানতঃ তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয় এবং অভিযোগ করতে থাকে। ইতোমধ্যে নিজের যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি। এমনকি যদি তারা এমনটি করতে চেষ্টাও করে, তাহলেও তাদের সমাধান অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়। কারণ, তারা তাদের চিন্তা খুব সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ করে থাকে।

এছাড়াও, যে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ পালন করা হয় না, সেখানে কোন সমাধান না পাওয়াটাকে নিষ্ক্রীয়তার প্রায় এক বৈধ অজুহাত হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এটা প্রায়শঃ দায়িত্বজ্ঞানহীন, অলস, উদাসীন বা শ্লথ আচরণের অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হয় । বিশেষতঃ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব কঠিন বলে দাবী করে। তারা নিজেদের এমন এক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করে, যারা কঠিন কাজের দায়িত্ব গ্রহন করেছে। এটা হল এক চালবাজি ; পরিকল্পনা করা হয় বড় বড় ভুল, অবহেলা, কিংবা ব্যর্থতা আড়াল করতে।

মূল যে কারণে আল কুরআন থেকে দূরবর্তী সমাজে জটিলতাগুলো সমাধানহীন থেকে যায়, তা হল এরকম সমাজের লোকেরা এমনকি তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সাথেও এঁটে উঠতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের নীতিমালা মেনে চলে না, সে নিজের

আকাঙ্খার স্রোতে ভেসে চলে। এই অর্থে সে কেবল নিজের আকাঙ্খা পূরণ করতে চেষ্টা চালিয়ে যায় ; সে সমাজের কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির কল্যাণে কিছু করতে আদৌ আগ্রহী নয়। যে কোন অবস্থাতেই সে নিজের স্বার্থের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। সে ঝামেলা, শক্তি এবং অর্থব্যয়, কিংবা অন্যের স্বার্থে অর্থব্যয় এড়িয়ে চলতে চায়।

এমনকি সবচেয়ে তুচ্ছ, সহজে সমাধানযোগ্য সমস্যাও তার জন্য ধাঁধাঁ হয়ে থাকে। প্রত্যেকে চেষ্টা করে চলে অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে, জেষ্ঠ্যদের নেক-নজরে এসে নিজের অবস্থানকে অনুমোদন করিয়ে নিতে, কিংবা সব সময় কামনা করে এমন একজন হতে, যার কথাই "শেষ কথা" হবে। এই ধরণের ব্যক্তিগত জটিল মনোভঙ্গী এবং প্রত্যাশা মানুষকে সমাধানে পৌঁছাতে ব্যর্থ করে দেয়। ধর্মের সাহায্যেই সন্তোষজনক উপসংহারে পৌঁছানো যায়। যে ব্যক্তি ধর্ম পালন করে না, তার অদক্ষতার মূল কারণ নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ

"এরা সকলে সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না, করলেও সুরক্ষিত গ্রামে বা দূর্গের মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের পরস্পরের মধ্যকার যুদ্ধই ভয়ানক। তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা সংঘবদ্ধ, কিন্তু আসলে তারা বিভিন্ন মানসিকতার। কেননা তারা সেই সব লোক যারা নির্বোধ।" (সূরা হাশরঃ ১৪)

টেলিভিশনের মুক্ত আলোচনার কোন অনুষ্ঠানে এটার উদাহরণ সচরাচর দেখা যায়। আলোচনায় অংশগ্রহনকারীগন একটা সমস্যা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেন, কখনো-বা প্রভাত পর্যন্ত। যেহেতু প্রত্যেকেরই যুক্তি দেখাবার প্রবণতা আছে, সেহেতু সাধারণ ভিন্নমত থেকেই যায়। একজন অংশগ্রহনকারী হয়ত উপলব্ধি করেন, অপরজনের ভাবনাই সঠিক, কিন্তু তাদের অহংকার বাধা হয়ে দাঁড়ায় এটা স্বীকার করে নিতে। তারা স্রেফ অপরজনকে অপদস্ত করার তাগিদ অনুভব করেন, এমনকি প্রকাশ্যে এটা বিরোধিতা করেন। কারণ, তাদের নিকট সত্যের অন্বেষণটা ব্যাপার নয়, বরং সেই ব্যক্তি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যটা বলে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তার নিকট সেই ব্যক্তি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যিনি শেষ সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। যারা যুক্তি প্রদর্শন করেন,

তারা অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ দেন শুধু এই কারণে যে, তারা তাদের জ্ঞানের জন্য স্বীকৃতি লাভ করতে চান। এখানকার মূল লক্ষ্য হল, স্মার্ট এবং জ্ঞানী দেখানোর যে কোন সুযোগ গ্রহন করা। তারা প্রায়শঃ মূল সমস্যা থেকে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যান এবং অনেক সময় পরে এসে উপলব্ধি করেন যে, তারা কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারেন নি। এটা লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয় যে, এই আলোচনা চলাকালে অধিকতর জটিলতা, দন্দ্ব এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটে। আসলে তারা কোন সমাধান খুঁজে পাবার মানসে আলোচনা শুরুই করেন না। তারা অসার দর্শন লালন করেন এবং তাতেই আশ্রয় খোঁজেন; তারা এই মত পোষণ করেন যে, আলোচনা করা, মতামত প্রকাশ করা এবং মতবিনিময় করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ সময় আলোচনা করেও কোন সমাধানে না পৌঁছানোটা তারা সম্পূর্ণ গ্রহনযোগ্য মনে করেন। সব চেয়ে বড় কথা, তারা এটাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করেন।

অপরপক্ষে, বিশ্বাসীরা যেহেতু সচেতন যে, আল্লাহ সবকিছুর হিসাব নেবেন, সেহেতু তারা সকল পরিস্থিতিতেই বিজ্ঞ, বিবেকবান এবং চিন্তাশীল থাকে। তারা সবচেয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেয় এবং শ্রেষ্ঠ সমাধান খুঁজে পায়। তারা দ্রুত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় এবং কোন প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় না। কারণ, তারা অতি উত্তম নৈতিকতা, শক্তিশালী দায়িত্ববোধ এবং আল কুরআন প্রদত্ত চিন্তাধারা দ্বারা চালিত হয়। তারা কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করে "পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে" (সূরা শূ'রাঃ ৩৮)। সব সময় তারা সেটাই বেছে নেয়, যেটা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট করে। কোন অবস্থাতেই তারা ন্যায়নিষ্ঠা এবং সত্যপরায়ণতা থেকে বিচ্যুত হয় না, এমনকি এটা তাদের স্বার্থ বা আত্মতুষ্টির প্রতিকূল হলেও।

কেবল আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর নিকট থেকে প্রতিদান লাভের অপেক্ষায় থাকার কারণে বিশ্বাসীরা অন্যদের অনুমোদন লাভের জন্য, তাদের দৃষ্টিতে বিশেষ মর্যাদা লাভের জন্য, তাদের মূল্যায়ন পাবার জন্য, মনোযোগ আকর্ষণ বা আত্মপ্রচারণার জন্য নিচে নামতে প্রস্তুত থাকে না। এই কারণে, তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তে তারা অবিরাম আল্লাহর সমর্থন, সাহায্য, প্রেরণা এবং অনুগ্রহ পেয়ে থাকে।

আল্লাহর উপরে গভীর ভীতি থাকার কারণে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা সঠিকভাবে মেনে চলা একজন বিশ্বাসীকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে পথনির্দেশনা দেয় (সূরা আনফালঃ ২৯) যেন সবচেয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে এবং সমাধানে পৌঁছাতে পারে। এই ভীতি থাকার কারণে এবং আল্লাহর নির্দেশ যত্নসহকারে মেনে চলায় তাদেরকে আল্লাহ "পরিত্রাণের পথ" বাৎলে দেন (সূরা তালাকঃ ২) এবং "বিষয়গুলি তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়" (সূরা তালাকঃ ৪)।

ইসলামি নৈতিকতা মানুষকে শেখায় আল্লাহর উপরে আস্থা স্থাপন করতেঃ যারা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করতে এবং ইসলামি নীতি অনুসারে জীবন যাপন করতে অনিচ্ছুক, তাদের আত্মা সব সময় হতাশাগ্রস্ত, বিদ্রোহী এবং মনমরা হয়ে থাকে; তাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, তাকে তারা আকস্মিকতার পরিণাম হিসাবে দেখে। সমস্ত জীবনব্যাপী তারা দুশ্চিন্তা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অস্থিরতায় ভোগে। বিশ্বাসীদের মত তাদের আল্লাহর উপরে আস্থা স্থাপনের সুযোগ নেই এবং তারা জানে না যে, যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তারা সচেতন নয় যে, ভাল বা মন্দ, সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে যেন মানুষকে এই পৃথিবীতে পরীক্ষা করা যায়। তারা এটাও জানে না যে, শান্তি অর্জন কেবল তখনই সম্ভব, যখন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কর্ম-সম্পাদন করা হয়। এভাবে তারা তাদের পছন্দমাফিক পথ বেছে নেওয়ার পরিণতি ভোগ করে। তারা জীবনে যত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তার প্রতিটাতে মনোকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করে, পরিস্থিতিটা গুরুত্বপূর্ণ হোক বা গুরুত্বহীন হোক।

এসবলোক তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা অনেক গুরুত্ব সহকারে নেয় এবং সাংসারিক ঘটনাকে এমনভাবে নেয় যেন এ-গুলিই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোন ঘটনা যখন তাদের পছন্দ বা পরিকল্পনা মাফিক না ঘটে, তখন তারা স্রেফ নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করে। তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয় এবং এটাকে তাদের উপরে আপতিত দুর্ভাগ্য মনে করে। তারা হতাশা বোধ করে এবং পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজে পায় না। যদি তারা আপাত প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখীন হয়, তাহলে তাহা হতাশায়

নিমজ্জিত হয় এবং আর্তনাদ, এমনকি বিলাপ করে। আল্লাহর নিকট আত্মনিবেদন না করায় তারা উপলব্ধি করে না যে, প্রত্যেকটা ঘটনা তাঁর নিয়ন্ত্রণে ঘটে।

দৈনন্দিন ঘটনার উপরে ভিত্তি করে তাদের মনোভাব রোলার কোস্টারের মত উঠানামা করে। এই জীবনে অনেক ছোটখাটো বিষয় থাকে যা তাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। তারা তাদের সময়, এমনকি সমস্ত জীবন কাটায় দুঃখ-বিলাপে। আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন না করার এই মনোভাব তার প্রাত্যহিক জীবনে, সমস্ত পরিস্থিতিতে এবং সমগ্র জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে ।

উদাহরণ স্বরূপ, একজন গৃহিনীর জীবনের অগ্রাধিকার তার পরিবার এবং গৃহকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি তিনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তিনি মোকাবেলা করতে অক্ষম, তখন তিনি একবারো ভাবেন না, এই ঘটনাটা আল্লাহর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়েছে এবং এর পরিণামে নিশ্চয় কোন কল্যাণ আছে। এই তুচ্ছ ঘটনাটার কারণে তিনি বিলাপ করেন এবং হতাশায় নিমজ্জিত হন। চুলার উপরে রাখা খাদ্যের কথা ভুলে যাওয়া কিংবা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের ঠিকমত কাজ না করার মত ঘটনা তাকে অনেক যন্ত্রণা দেয়। যাহোক, নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ না করায় এবং ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন না করায় খুব সাধারণ একটা সমস্যা তার বড় দুঃখের কারণ হতে পারে।

এই একই মানসিকতা এই গৃহিনীর স্বামীরও বৈশিষ্ট্য, যিনি একটি কোম্পানির ব্যবস্থাপক। তার ব্যবসায়িক জীবনে কিছু সমস্যা রয়েছে। তিনি মনে করেন, গৃহে তার স্ত্রীর সমস্যা নিতান্ত নগণ্য। তার মতে, তার নিজের সমস্যাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন– এটি উপলব্ধি করতে না পারায় এই ধরণের লোকের দৃষ্টিভঙ্গী ইতিবাচক হয় না, এবং সে মানসিক অশান্তিতে ভোগে। এই একই ব্যাপার শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা এমন পরিবেশে বাস করে যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্মান পায় না। তাদের জগতে, বিদ্যালয়-প্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ১০-১৫ বছরের শিক্ষাজীবন তাদেরকে খুবই আচ্ছন্ন করে রাখে। তারা কোন এক পরীক্ষায় ভাল না করতে পারায় সৃষ্ট হতাশা কাটাতে পারে না বললেই চলে, এমনকি সম্মানজনক সংখ্যক

A পাবার পরেও। তারা বন্ধুত্ব এবং জনপ্রিয়তা নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে। তাদের মাতা-পিতা এবং নিকটজনের ঋণ হল তাদের হতাশা, অসহায়ত্ব, সমাধানহীনতা, এবং অভিযোগের কারণ । এটা তাদের জন্য এক স্থায়ী মনোভঙ্গী। এই মনোভাবের একমাত্র কারণ হল ধর্মীয় বিধানের আনুগত্য না করা। তারা তাদের স্রষ্টাকে জানে না এবং তাঁর উপরে আস্থা স্থাপন করে না– এ হল তাদের অসহায় অবস্থার অন্য কারণ।

যেসব সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয় না, (সেই সমাজের লোকেরা সার্বক্ষণিক হতাশা এবং অসহায়ত্বে ভোগে, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) সেই সমাজের লোকেরা ভাবে, জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো তারই। যারা সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে রয়েছে, তারাও একই রকম বিষণ্নতায় ভোগে যখন জীবনে প্রত্যাশিত কিছু লাভ না হয়।

যাহোক, মানুষ যদি আল কুরআন-প্রদত্ত সমাধান অনুসরণ করে, তাহলে কখনো তাকে দুশ্চিন্তা বা হতাশায় ভুগতে হবে না। যখনই সে হতাশা বোধ করে, তখনই তার স্মরণে আসে যে, সবচেয়ে নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যেও নিশ্চিতভাবে আল্লাহ ইতিবাচক কিছু রেখেছেন। ইসলামি নৈতিকতা অনুসরণ সব রকম হতাশা এবং ব্যর্থতার অনুভূতি নির্মূল করে। তখন একজন তার উপরে আপতিত ছোট-বড় সব সমস্যা ইতিবাচক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করে। এই যৌক্তিক অবস্থান ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে শান্তি এনে দেয়।

ইসলামের নৈতিকতা অনুসরণে কেউ কোন ঘটনাকে কেবল আকস্মিকতা বা কাকতালীয় ঘটনার ফল হিসাবে দেখে না। যা কিছু ঘটে তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে– এটা বিবেচনা করায়, একজন ঘটনার পিছনের উদ্দেশ্য এবং মানবজাতির প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত বাণী অনুধাবনের চেষ্টা করে।

এই কারণেই, যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিদ্যমান, সেখানে কেউ “কেবল” “যদি” জাতীয় কথা বলে না। আপনি কখনো শুনবেন না এরকম বক্তব্য “আমি যদি গতকাল

না যেতাম, তাহলে আমি পড়া-লেখা করতে বিদেশ যেতে পারতাম. . . তুমি যদি আরো আগে আসতে, তাহলে তুমি তাকে দেখতে পারতে . . . আমরা এই পথে কেন এলাম? এখানে যানজট . . . আমি যদি তোমাকে বিয়ে না করতাম, তাহলে আমার যৌবনকাল কাটাতে পারতাম . . .আমি যদি এই পোশাক না পরতাম, তাহলে আমার রাতটা বরবাদ হত না . . . আমি যদি বাইরে না যেতাম, তাহলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম না . . . আমি যদি ভ্রমন না করতাম, তাহলে আমার দুর্ঘটনা ঘটত না . . . যদি সে অন্য কোন ডাক্তারের কাছে যেত, তাহলে সে আরো আগেই সুস্থ হয়ে উঠত . . . সে যদি সেই বিমানে উঠত, তাহলে সে বেঁচে যেত।" যেসবলোক আল্লাহকে ভুলে এবং ধর্মকে অবজ্ঞা করে জীবন যাপন করে, তারা প্রায়শঃ বলে "কেবল, যদি" এবং পরিশেষে পরকালেও একই কথা বলবে। যদিও, সন্দেহ নেই, এই অনুতাপ বিফলে যাবেঃ

"দোজখের পাশে দাঁড়ানো তাদের অবস্থা যদি তুমি দেখতে এবং তাদেরকে বলতে শুনতেঃ হায়! যদি পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরিত হতাম, তাহলে প্রতিপালকের বাণী অস্বীকার করতাম না এবং বিশ্বাসীদের দলভূক্ত হতাম।" (সূরা আনআমঃ ২৭)

মানবদেহের উপরে বিশ্বাসহীনতার নেতিবাচক প্রভাব

সমাজের উপরে অনেক অনাকাঙ্খিত প্রভাবের সাথে সাথে মানুষের শারীরীক এবং আত্মিক কল্যাণের পক্ষেও বিশ্বাসহীনতা ক্ষতিকর। এই অধ্যায়ে আমরা এই দৈহিক এবং আত্মিক ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করব।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা ইসলামের নীতির বন্ধনে আবদ্ধ নয়, তারা সার্বক্ষণিক দুঃখ, সংকট এবং মানসিক চাপে থাকে। এভাবে তারা অনেক মানসিক

ব্যধিতে ভোগে। তাদের দেহে দ্রুত বার্ধক্যের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আত্মিক ভোগান্তি তাদের দেহকে আক্রমণ করে।

এসব প্রভাব এমনকি সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান, তরুণ এবং সুন্দর ব্যক্তিদের উপরেও ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। শারীরীক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে– চুল ও চোখের রঙ বিবর্ণ হওয়া, অতিরিক্ত চুল পড়া, অল্প বয়সে টাক পড়া। অবশ্য একই বয়সের একজন বিশ্বাসী এসব কিছুতে ভোগে না। মনস্তাত্বিক কারণে ত্বক পুরু হয়ে যায়, রুক্ষ হয়ে যায় এবং স্বল্প সময়ে নমণীয়তা হারায়। শীঘ্রই তার ত্বক দেখতে স্বাস্থ্যহীন মনে হয়। কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআনের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত নির্দেশনা মেনে না চলার গভীর প্রভাব তাদের উপরে পড়ে। এসব বৈশিষ্ট্য সেই সমাজে সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়, যেখানে মানুষ ইসলামের নৈতিকতা অনুসারে জীবন যাপন করে না এবং কুরআনকে সত্য পথের দিশারী হিসাবে গ্রহন করে না। এগুলোর ব্যাপকতা এতটাই যে, এগুলোকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বলে বিবেচনা করা হয়। তারা এই জগতে বিশ্বাসহীনতাকে বেছে নেবার পরিণতি ভোগ করতে আরম্ভ করে; পরলোকে তো রয়েছে আরো কঠিন পরিণতি।

যাহোক, বিশ্বাসীরা স্বাস্থ্যবান থাকে, কারণ তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে; দুঃখ, মানসিক চাপ বা অসহায়ত্বের অনুভূতি তাদেরকে টেনে নামায় না। আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখায় তারা প্রতিটি ঘটনার মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করে। আল্লাহর প্রতীজ্ঞা এবং সুসংবাদের প্রতি আস্থা রাখায় তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উপরে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই অবস্থা প্রযোজ্য সেই সব লোকের ক্ষেত্রে, যাদের আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং যারা সত্যিকার অর্থে বিবেকবান।

অবশ্য, বিশ্বাসীরাও অসুস্থ হয়, বার্ধক্যে উপনীত হয়। তবে এসব অবস্থার মানসিক কারণ থাকে না, যেমনটি থাকে অবিশ্বসীদের ক্ষেত্রে। রোগ, মৃত্যু এবং বার্ধক্য সমস্ত মানুষের জন্য অবশ্যম্ভাবী। তবুও বিশ্বাসহীন জীবনধারার অনুবর্তী হবার কারণে একজন ব্যক্তি যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে তার সমস্ত জীবন যাপন করে, তার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে রোগ-ব্যধির তীব্রতা এবং ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির। যে ব্যক্তি

আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে প্রতিটি ঘটনার মধ্যে কল্যান তালাশ করে, সে স্বভাবতঃই সুখী এবং শান্তিময় জীবনের অধিকারী হয়। এভাবে সে সেই সব ক্ষতি প্রতিরোধ করে যা সংকট সৃষ্টি করতে পারে, কিংবা তার স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।

যে সমাজে মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করে না, সেখানকার মানুষ ধর্মের দেওয়া শান্তি ও স্বস্তি থেকে বঞ্চিত থাকে এবং পরিণামে মানসিক ও শারীরীক ক্ষতির শিকার হয়। সমাজে এই ধরণের উদাহরণ সুপ্রচুর।

আমাদের সময়কালে, দুইটা ব্যাধিকে "এ-যুগের অভিযোগ" হিসাবে অভিহিত করা হয়ঃ মানসিক চাপ ও বিষন্নতা। এই দুটো কেবল "আটপৌরে" অভিযোগ নয়, বরং শারীরীক অসুস্থতার সাথে সম্পৃক্ত।

মানসিক চাপ ও বিষন্নতার সাথে সম্পর্কযুক্ত সবচেয়ে পরিচিত যে অসুস্থতা, তারা হল মানসিক বিভিন্নতাঃ মাদকাসক্তি এবং নিদ্রাহীনতা। এর সাথে রয়েছে ত্বকের এবং তলপেটের রোগ, সেই সাথে রক্তচাপ, কিডনি এবং শ্বাসযন্ত্র, এ্যালর্জি, সর্দি, মাইগ্রেন, হৃদ্‌পিণ্ডের রোগ এবং মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত অসুস্থতা। অবশ্যই, এসব রোগের সাথে কেবল মানসিক চাপ ও বিষন্নতাকে সম্পৃক্ত করা ভুল হবে। তবে এক ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এসবরোগ প্রায়শঃ মানসিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত হয়।

যে জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান গুরুত্ব পায়, সে-জীবন আল্লাহর প্রতি আস্থা স্থাপন এবং নিয়তির উপরে বিশ্বাসকে অনিবার্য মনে করে। আল্লাহ তাঁর সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের বন্ধু– এটা জেনে একজন লোক নিরাপত্তা বোধ করে। এটা এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী যা অবলম্বন করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি। পরিণতিতে, যে কোন পরিস্থিতিতে বিবেকবানের মত সবচেয়ে ভাল আচরণ করায় সে স্বস্তিবোধ করে থাকে। এমনকি সবচেয়ে মন্দ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও, একজন বিশ্বাসী এটাকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসাবে মেনে নেয় এবং আল কুরআন-নির্দেশিত উপায়ে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে। সে কখনোই হতাশায় নিপতিত হয় না, কিংবা বিপর্যস্ত বোধ করে না। মনে-

প্রাণে সে পারলৌকিক জীবনকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে গ্রহন করে। তার কাছে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এমনভাবে আচরণ করা, যা তাকে পরলোকের অনন্ত পুরস্কার এনে দেবে। আল্লাহর প্রতি জোরালো বিশ্বাস থাকার কারণে, আপাত নেতিবাচক ঘটনাগুলো তাকে বিপর্যস্ত করে না কিংবা তার মন ভেঙ্গে দেয় না। ফলতঃ তার শান্ত এবং ইতিবাচক মনোভঙ্গী একটি শক্ত গঠন লাভ করে।

মৌলিকভাবেই ধর্মীয় নিয়ম-নীতি মেনে চলা জীবন এবং ধর্মবিবর্জিত জীবন যাপন পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। একজন অবিশ্বাসীর প্রধান উচ্চাশা হল, "জীবনটাকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করা", জীবনটাকে উপভোগ করার জন্য শক্তি এবং সম্পদ টিকিয়ে রাখা। এই অর্থে, সে প্রবলভাবে তার দেহের প্রতি অনুরাগী থাকে, যা তার উচ্চাশাকে সম্ভব করে তোলে। তার বিশ্বাস, এটাই করার মত সবচেয়ে লাভজনক কাজ। তবে সে স্পষ্টতঃই ভুলের মধ্যে রয়েছে। কুরআনের মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়াটা তাকে মনোমুগ্ধকর জীবনের পরিবর্তে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পরলোকে মহাযন্ত্রণায় পতিত হবার আগেই তার এই জীবন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। এভাবে যে দেহ সব রকম আনন্দ উপভোগের জন্য সযত্নে লালিত হয়েছে, সেটা অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিকারহীন ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

মানুষের দেহ-মন উভয়কেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যেন যৌথভাবে ধর্মীয় জীবন যাপন করতে পারে। তারা এমন এক পদ্ধতিতে সমন্বিত, যাতে ধর্মীয় মূল্যবোধ টিকে থাকে এবং সেই মোতাবেক যথাযথ গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত। যখন দেহ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন এটার পরিণতি হয় দূষণ এবং বিনাশ। আসলে মানবদেহ ও মন আল্লাহর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সৃষ্টি হওয়ায় তাদেরকে অবশ্যই সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা উচিত।

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা জোর দিয়ে বলেছি, আল্লাহর নির্দেশিত নীতি অগ্রাহ্য করা হলে কিভাবে মানবাত্মা এই পৃথিবীতে বিরাট যন্ত্রণার ঝুঁকিতে পড়ে। যারা এমনটি করে, তারা তীব্র শারীরীক ক্ষতিতেও ভোগে। দেহ ও আত্মার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রকাশ পায় সমাজের অসংখ্য উদাহরণে। লক্ষ্য করা যায়, আনন্দিত এবং প্রশান্ত

লোকেরা প্রতিটি ঘটনার ইতিবাচক মূল্যায়ন করে এবং তার উপর যা-ই ঘটুক সব কিছুতেই কল্যাণ দেখতে পায়। তারা হতাশা প্রদর্শন করে না কিংবা ক্রোধ প্রকাশ করে না। এই ধরণের লোক এমনকি জীবনের অন্তিম ধাপেও বেশ বলবান থাকে, বার্ধক্যের প্রক্রিয়া তাদের দেহে অনেক দেরিতে শুরু হয়। এই কারণে স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা এবং খবরের কাগজের এই সম্পর্কিত কলামে পাঠকদের সুখী জীবনের ব্যবস্থাপত্র হিসাবে জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহন করতে জোর তাগিদ দেওয়া হয়। তারা সাধারণভাবে যা সুপারিশ করেন তা হল, শান্ত এবং আশাবাদী থাকা, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এগুলি এমন সব বৈশিষ্ট্য যা একজন সত্যিকার অর্থে লাভ করতে পারে কেবল ধর্মীয় নিয়ম-নীতি অনুসারে জীবন যাপনের মাধ্যমে। আল কুরআনের নৈতিকতার পরিপূর্ণ অনুসরণ ছাড়া মানুষের নিজের মেজাজের উপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ধর্মীয় মূল্যবোধ অবহেলিত হলে মানসিক চাপ অনিবার্যঃ মানসিক চাপ হল আতঙ্কজনকভাবে ব্যাপক এক দুর্দশা, যা "বিশ্বব্যাপী যন্ত্রণা" নামে পরিচিত। এটার উৎস হল মনস্তাত্বিক। এটা দেহ-মনের দুশ্চিন্তার সাধারণ অবস্থা যার কারণ হল ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা, উৎকণ্ঠা, চাকুরি হারানো, স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কিংবা পরিবারের কোন সদস্য হারানো।

দেহ উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়া দেখায়, ধারাবাহিক জৈব-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া শুরুর মাধ্যমে। রক্তে এড্রিনালিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, সেই সাথে শক্তি আত্মীকরণ উচ্চমাত্রায় পৌঁছায় এবং দৈহিক প্রতিক্রিয়া বেগবান হয়। ইতোমধ্যে, শর্করা, কোলেস্টেরল এবং ফ্যাটি এসিড রক্তস্রোতে মিশে যায়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং হৃদপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি পায়।

দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ দেহের বিশেষ করে দৈহিক ক্রিয়ার বড় ক্ষতি করে থাকে । মানসিক চাপের কারণে এবং এড্রিনালিন গ্রন্থি নিঃসৃত কর্টিসোন হরমোনের মাত্রা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের দিকে ধাবমান গ্লুকোজ উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল বহন করে, যার অর্থ দেহের জন্য বিপদ। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ হৃদরোগ, উচ্চ

রক্তচাপ, আলসার, বিষন্নতা, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, একজিমা, সোরিয়াসিস এবং অন্য অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং মানসিক চাপজনিত ব্যথার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতে, মানসিক চাপের কারণে সৃষ্ট উত্তেজনা রক্তবাহী নালীকে সংকুচিত করে; এর ফলে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। এই প্রক্রিয়া শেষ হয় উল্লেখিত অংশগুলিতে কম রক্ত সরবরাহ হিসাবে। ইতোমধ্যে, অধিক সময় রক্ত সরবরাহে ঘাটতি হলে দেহকলায় ব্যথা শুরু হয়। মানসিক চাপের সময় টানটান হয়ে যাওয়া দেহ-কলার জন্য অধিক অক্সিজেন প্রয়োজন হয়; কিন্তু স্বল্প রক্তের সাথে তার সরবরাহও স্বল্প হয়। তখন এটা বিশেষ ব্যথা গ্রহনকারী স্নায়ুতন্ত্রকে সজাগ করে দেয়। ইতোমধ্যে, উৎকণ্ঠার সময় স্নায়ুর উপরে প্রভাব সৃষ্টিকারী হরমোন এড্রিনালিন এবং নোরাড্রিনালিন নিঃসৃত হয় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেশীর উপরে চাপ বৃদ্ধি করে। এই চাপের কারণেই ব্যথা জাগে। তখন শুরু হয় এক অশুভচক্রঃ বেদনা থেকে দুশ্চিন্তা, দশ্চিন্তা থেকে উৎকণ্ঠা এবং উৎকণ্ঠা থেকে তীব্র বেদনা।

মানসিক চাপ থেকে সৃষ্ট অন্যতম গুরুতর একটি দৈহিক জটিলতা হল হার্ট এ্যাটাক। গবেষণার একটি বড় সংকলন থেকে দেখা যাচ্ছে, যেসব লোক আগ্রাসন, উৎকণ্ঠা এবং প্রতিযোগিতাপ্রবন, তাদের হার্ট এ্যাটাকের সম্ভাবনা তাদের তুলনায় বেশি যাদের নিজ জীবনে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা রয়েছে। এ-সম্পর্কিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা মতে, সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের অতিরিক্ত উত্তেজনা, যা শুরু হয় হাইপোথ্যালামাসের দ্বারা, অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ ঘটায় আর এর ফলে রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এটা স্বাস্থ্যের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। কারণ, উপরোক্ত অবস্থাই করোনারি শিরার যেসবরোগ ঘটায় তার কোনটাই ততটা ক্ষতিকর নয়, যতটা ক্ষতিকর রক্তে ইনসুলিনের আধিক্য।

এটা মানবদেহের জন্য এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং অধিককাল এটা বিরাজ করাটা স্বাস্থ্যের জন্য এবং দেহের স্বাভাবিক ভারসাম্যের জন্য ক্ষতিকর। মানবদেহের উপরে মানসিক চাপের নেতিবাচক প্রভাবগুলো মূলতঃ নিম্নরূপঃ

উদ্বেগ এবং আতঙ্কঃ কারো জীবনে উপদ্রবের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারানোর ব্যাপারে উদ্বেগ।
ঘর্মাক্ত হওয়াঃ অতিরিক্ত ঘাম ঝরা এবং বার বার শৌচাগারে যাবার প্রয়োজনীয়তা।
কণ্ঠস্বর পরিবর্তনঃ তোতলানো, কণ্ঠস্বরে কাঁপন।
অতি তৎপর অবস্থাঃ হঠাৎ অতি শক্তির বহিঃপ্রকাশ, দুর্বল ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ।
অনিদ্রাও দুঃস্বপ্ন।
ত্বকের সমস্যাঃ ব্রণ, জ্বর, একজিমা এবং সোরিয়াসিস
অন্ত্র/ খাদ্যনালীর লক্ষণসমূহঃ অজীর্ণ, আলসার, বমি বমি ভাব
পেশীর উত্তেজনাঃ দাঁত লেগে যাওয়া বা দাঁত কড়মড় করা, চোয়ালে ব্যথা, পিঠ, ঘাড় এবং কাঁধে ব্যথা।
মৃদু সংক্রমণঃ সর্দি ইত্যাদি।
মাইগ্রেন, দ্রুত হৃদস্পন্দন, বুকে ব্যথা, উচ্চরক্তচাপ, কিডনির গোলোযোগ, দেহে পানি জমা, শ্বাসতন্ত্রের গোলোযোগ, হাঁপিয়ে ওঠা, এলার্জি, হার্ট এ্যাটাক, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস, মস্তিষ্কের আকার হ্রাস পাওয়া, অপরাধবোধ, নিরাপত্তাহীনতা, বিশৃঙ্খলা, বিচারবুদ্ধির দুর্বলতা, ধারণা গঠনে ব্যর্থতা, দুর্বল স্মৃতিশক্তি, প্রচণ্ড হতাশা, একটা জোরালো বিশ্বাস যে, সবকিছু ঠিকঠাক চলবে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে সমস্যা, মনোযোগ প্রদানে ব্যর্থতা কিংবা মনোযোগ প্রদানে সমস্যা, মানসিক দুর্বলতা, স্পর্শকাতরতা, অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হওয়া, ক্ষুধামন্দা কিংবা অতিরিক্ত ক্ষুধা।

যেসব লোক ইসলামি নৈতিকতা প্রদত্ত উপকারিতার ব্যাপারে অসচেতন, কিংবা যেসব লোক এ-গুলি থেকে অনেক দূরে, তাদের ভাগ্যে "মানসিক চাপ" নামক এই যন্ত্রণা রয়েছে। যতদিন তারা তাদের জীবন এবং ঘটনাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে অটল থাকবে, ততদিন তাদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানসিক চাপ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ থেকে। একটি উদাহরণ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবে। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ-প্রদত্ত ধর্মের অন্যতম এক নির্দেশনা হল "ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ কর"। বিশেষজ্ঞরা ক্রোধের ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন, যেটিকে বিবেচনা করা হয় মানসিক চাপের এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণঃ "মেজাজ খারাপ করবেন না, পরিস্থিতি যতই উস্কানিমূলক হোক না

কেন। সহিংসতার পথ ধরবেন না (যেখানে আপনাকে আত্মরক্ষা করতে হবে সেই অবস্থা ব্যতীত) এমনকি যদি আপনার মনে হয় আপনার তেমনটি করার কারণ আছে।"

আমরা যেমনটি দেখেছি, যখনই একজন লোক শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট ও নির্বিকার থাকতে সফল হয়, তখন সে অনেক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়। এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। এটি স্পষ্ট যে, শান্তিপূর্ণ এবং আরামপ্রদ মানসিক অবস্থা কেবল ধর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

মানসিক চাপ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় জটিলতা সৃষ্টি করেঃ মানসিক চাপের সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সম্পর্ক গভীর। মানসিক চাপ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপরে প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। চাপের সময় মস্তিষ্ক কোলেস্টেরল হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়। অন্য কথায়, মস্তিষ্ক, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং হরমোন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

মনস্তাত্বিক এবং শারীরীক চাপ নিয়ে যেসব গবেষণা, তা প্রকাশ করে যে, দীর্ঘস্থায়ী তীব্র চাপের পরে দেহের হরমোন ভারসাম্যের অভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে । এটি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত যে, মানসিক চাপের সাপেক্ষে ক্যান্সারসহ অনেক রোগ সৃষ্টি হয় এবং তীব্রতা পায় ।

এই কারণে, শান্ত মস্তিষ্ক এবং প্রশান্ত মানসিকতা সাধারণভাবে শারীরীক ব্যবস্থাপনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এটা রোগ সৃষ্টিকারী কারণগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকে রূপান্তরিত হয় । আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নিঃসন্দেহে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করে, যা একজন ব্যক্তিকে শক্তিশালী মানসিকতা এবং মনোবল অর্জন করতে সাহায্য করে। প্রত্যেক ঘটনার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব অবলম্বনকে উপাসনা বিবেচনা করা হয়, যদি এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হয়ে থাকে। পূর্ণ আশাবাদী চেতনা এবং আল্লাহর উপরে আস্থা স্থাপন– এগুলি সেই মনোভাব যা আল কুরআন বিশ্বাসীদেরকে শিক্ষা দেয়। আল কুরআন তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয় পরলোক অর্জন করতে, সেই সঙ্গে

এই জীবনে তাদেরকে দান করে সুখী, আনন্দপূর্ণ, আশীর্বাদপুষ্ট জীবন। যাহোক, এটি অপরিসীম অনুগ্রহের এক সামান্য অংশ– যে অংশটুকু মানুষ এই পৃথিবীতে উপভোগ করতে পারে। আল্লাহ এই অনুগ্রহের প্রতীজ্ঞা করেছেন তাদের প্রতি, যারা তাঁর মুখাপেক্ষী হয় এবং যারা তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে চায়। অবশ্য এটার অর্থ এই নয় যে, বিশ্বাসীরা কখনো অসুস্থ হয় না, কিংবা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় না। এটা হল স্রেফ অন্যদের তুলনায় বিশ্বাসীদের রোগগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা কম, যেহেতু তারা কখনো মানসিক চাপ বা মন্দ মনোভাব পোষণ করে না।

এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখের দাবী রাখেঃ মানুষ নিশ্চয় রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন যাপন করে না । তবুও, ঘটনার সাধারণ প্রবাহে, আল্লাহর উপরে আস্থা রাখা এবং তাঁর নির্ধারিত বিধান মান্য করা মানসিক ও শারীরীক কল্যাণের পথ দেখায়। অন্য কথায় বলতে গেলে, বিশ্বাসীরা স্বাস্থ্যবান মানুষ– এটা হল তাদের মজবুত বিশ্বাস এবং আত্মিক শক্তির ফল ।

সোজা কথা হল, একবিংশ শতাব্দীর মানুষের একটি কাজ করা দরকারঃ আল্লাহ তার জন্য যে স্বভাব-প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, সেদিকে ফিরে আসা এবং ধর্মীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলার অঙ্গীকার করা। অন্যথায়, এই জগতে এবং পরজগতে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভূক্ত হবে। মানসিক এবং মনস্তাত্বিক প্রতিকূলতা ছাড়াও তাকে মন্দ স্বাস্থ্য নিয়ে জীবন কাটাতে হয়; তাকে পালৌকিক জীবনে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে, বিশ্বাসীরা তাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং ধর্মের আনুগত্যের কারণে সব সময় শান্তি এবং প্রাচুর্যের জীবন যাপন করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ
সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান করে

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের মানসিকতা এবং এই বৈশিষ্ট্য থেকে সৃষ্ট সাধারণ মানবীয় চরিত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি । এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, কিভাবে বহুযুগের পুরাতন সামাজিক সমস্যাবলী ধর্মীয় বিধান অনুসরণের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে।

সব রকমের অবক্ষয়ের অবসান ঘটেঃ ধর্মীয় বিধান থেকে মুক্ত সমাজের সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল অবনতির প্রচলন এবং সমাজের সকল স্তরে এটার গভীর অনুপ্রবেশ এবং প্রতিটি দিন অতিক্রমের সাথে সাথে এই সমস্যার প্রকটা বৃদ্ধি। যখন মানুষ কুরআনের নীতি অনুসরণ করে না, এবং আল্লাহ-ভীতি কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টিঅর্জনের মত মূল্যবোধ বিবর্জিত হয়, তখন এই অবক্ষয় প্রতিরোধের কোনই উপায় থাকে না। সন্দেহ নেই, ব্যক্তি বিশেষ কিংবা নেতৃবৃন্দের গড়ে তোলা কিছু ঐতিহ্য, রীতি-নীতি এবং সামাজিক বিধান সাধারণ সামাজিক আচরণের আকার পায়। কিন্তু এ-গুলো যেহেতু মানুষের গড়ে তোলা এবং আল্লাহ-ভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেহেতু সমাজের উপরে এ-গুলোর প্রভাব দুর্বল। শেষ পর্যন্ত, এ-গুলো নির্মম, বিবেকহীন এবং অমানবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যে ব্যক্তি অনৈতিক আচরণ করে, সে আরো নীতিহীন হবে না– তার কোন কারণ নেই। একজন চাকুরীদাতার কথা ভাবুন। তার যদি আল্লাহর উপরে বিশ্বাস না থাকে এবং তাঁকে ভয় না করেন, তাহলে বিবেকবর্জিত কাজের যে কোন সুযোগ গ্রহন করবার সিদ্ধান্ত তিনি আগেই নিয়ে বসেন । এর কারণ হল এই যে, আল্লাহর নির্দেশনা মান্য না করা এবং তাঁর অনুগ্রহ মূল্যায়ন না করাটা হল সবচেয়ে বিবেকহীন আচরণের উদাহরণ। অতএব, তার নিজের ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে, এই

চাকুরিদাতা তার অধীনস্তদের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে দুর্ব্যবহার করবে না, পীড়া দেবে না, কিংবা অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অধিক সময় কাজ করতে বাধ্য করবে না– এমন কোন কারণ নেই। তার নিজের বিবেকবোধের মধ্যে, এগুলো তার যুক্তিসঙ্গত মনোভাব। নিজের মাতা-পিতার প্রতি সে একই অনুচিত মনোভাব পোষণ করে; সে তাদেরকে প্রতারিত করে, কিংবা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে দ্রুত হাতিয়ে নেয় প্রচুর অর্থ-সম্পদ। তাকে এমনটি করা থেকে কোন কিছুই বিরত রাখতে পারে না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যখন আল্লাহ-প্রদত্ত বিধান সামাজিক মানদণ্ড হয় না, তখন একজন থেকে অন্যজনের নৈতিক বিবেচনা খুবই পৃথক হয়। একটি অনৈতিক মনোভাব একজন হয়ত প্রত্যাখ্যান করল, সেটিই আবার অন্যের নিকট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কাজেই, যেখানেই ধর্মীয় মূল্যবোধের কোন প্রভাব নেই, সেখানে মানুষ, সমাজ, যুগ, অঞ্চল, নগর কিংবা দেশ তাদের নিজস্ব নৈতিকতা গড়ে নেয় যা পরস্পর থেকে ভিন্ন। নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপারে একক পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে কোন্‌টা সঠিক এবং কোন্‌টা বেঠিক সেই ব্যাপারে সমাজ অসংখ্য মতবিরোধ এবং দন্দ্বের পটভূমিতে পরিণত হয়। প্রতিটি নতুন প্রজন্ম তার আগের প্রজন্মের চেয়ে বেশি অবনতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

নৈতিক অবক্ষয় প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান হারে সমাজকে কলুষিত করতে থাকে। যখন আল্লাহতে পূর্ণ বিশ্বাসের অভাব থাকে, তখন সমাজ দ্রুত কলুষিত হয়ে পড়ে । এভাবে, আগের বছর যে আচরণ চরম নিকৃষ্ট বলে বোধ হয়, তাকেই সমাজের সেই লোকেরাই পরবর্তী বছর আঁকড়ে ধরে। এই অবনতির নিম্নযাত্রা নিশ্চিতভাবেই সমাজের ধ্বংস সাধন করে। বিশ্বাসহীনতার ফল স্বরূপ সৃষ্ট অনৈতিকতা প্রতিদিন বিস্তার লাভ করতে থাকে। মজার ব্যাপার হল এই যে, অনৈতিকতাকে 'আধুনিকতা' হিসাবে উপস্থাপন করা হয় এবং এটাকে মতবাদে পরিণত করা হয়। "একবিংশ শতাব্দীর মানুষের মুক্ত তথা বন্ধনহীন হওয়া উচিত"– এই নীতিবাক্য এমন এক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্তসার, যা অবিশ্বাসী ভাবাদর্শীদের মনে বদ্ধমূল হয়।

সমগ্র প্রজন্ম অল্প বয়সেই অনৈতিকতার সাথে পরিচিত হয়। আসলে ইউরোপ-আমেরিকায় হত্যাকাণ্ড সংঘটনকারী শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দূর প্রাচ্য থেকে দুঃখজনক সংবাদ আসে, শিশুদের উপরে সকল প্রকার যৌন নীপিড়ন করা হয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। আশির দশকে, যৌনবিকৃতি এমন এক বিষয় ছিল, যা নিয়ে কথা বলতেও মানুষ বিব্রত বোধ করত। অথচ আজ মানুষ এ-গুলোকে আধুনিক জীবন-যাত্রার অংশ বিবেচনা করতে তৎপর। তারা এমনকি বিকৃত সম্পর্ক স্থাপনকারীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে। পক্ষান্তরে, যারা তাদেরকে বিরোধিতা করে, তাদেরকে আধুনিক নয় বলে অভিযুক্ত করা হয়। বিশ্বাসহীন সমাজে বসবাসকারী মানুষের এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী আল কুরআনে আক্ষেপের সাথে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

“যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রচার করতে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি; আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” (সূরা আন নূরঃ ১৯)

পক্ষান্তরে, সেই সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ঘটার সম্ভাবনা নেই, যেখানে ধর্মীয় নৈতিকতা বিরাজ করে। মোটের উপরে, গভীর আল্লাহ-ভীতি থাকার কারণে মানুষ অনৈতিকতা বর্জন করে। এই লক্ষ্যে কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণ করাই যথেষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ, নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহ-প্রদত্ত নৈতিক মানদণ্ড স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

“নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেন সুবিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার, আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন করতে। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহন করবে।” (সূরা আন নাহলঃ ৯০)

যেসব বিশ্বাসী আল কুরআনের এসবনির্দেশনা অনুসরণ করে, তারা আল্লাহর নির্দেশিত সীমা লঙ্ঘন না করার ব্যাপারে নিষ্ঠার সাথে মনোযোগ দেয়। এভাবে , একটি সত্যিকারের বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়ে অনৈতিক আচরণ অতি নগণ্যই লক্ষ্য করা যায়।

যদি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়, এবং কিছু ব্যক্তি ভুল করে, সেটা সমাজের কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। কারণ, সত্যিকারের বিশ্বাসীরা এই অনৈতিকতাকে মেনে নেয়

না। তাছাড়া, অজ্ঞ সমাজের মত অনৈতিকতাকে উৎসাহিত করা কিংবা মোটের উপরে তা সমাজে ব্যাপকতা লাভ করার কোন সম্ভাবনা এখানে থাকে না। এর কারণ হল, বিশ্বাসীদের অন্যতম প্রধান একটি দায়িত্ব হল "সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ প্রতিরোধ" যেমনটি নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছেঃ

"সত্যিকারের বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ প্রদান করে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে, তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই বর্ষিত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ।" (সূরা আত তাওবাঃ ৭১)

সুতরাং, যে সমাজে কুরআনের মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়, তা নৈতিকভাবে এক সম্ভ্রান্ত সমাজ। কারণ, সেখানে ". . .বিশ্বাসীরা ভাল কাজের প্রতিযোগিতা করে" (সূরা আল ইমরানঃ ১১৪)। বিশ্বাসীদের আরেক গুণের কথা নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"তার কথা অপক্ষো আর কার কথা উত্তম যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলেঃ আমি মুসলিম তথা আত্মসমর্পণকারীদের দলভূক্ত।" (সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৩)

"যারা আমার উপদেশ শ্রবন করে, . . আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন; এরা হল বুদ্ধিমান।" (সূরা জুমারঃ ১৮)

আল্লাহ সেই সম্প্রদায়ের গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন, যার সদস্যরা ধর্মের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করেঃ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবতার কল্যাণে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখবে।" (সূরা আল ইমরানঃ ১১০)

আমাদের মহানবী (সাঃ) তাঁর এক বাণীতে উল্লেখ করেছেনঃ "একজন বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসীর দর্পণ স্বরূপ" (আবু দাউদ) এবং বিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে পরস্পরের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। তিনি বলেছেনঃ "সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী বিশ্বাসী ব্যক্তিই সত্যিকারের বিশ্বাসী।" (আবু দাউদ)

এটি স্পষ্ট যে, নৈতিকভাবে এরকম সমাজ বিশ্বাসহীন সমাজের চেয়ে উত্তম।

ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ পারিবারিক বন্ধন মজবুত করেঃ একটি মজবুত এবং সফল সামাজিক কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে এমন সব পরিবারের উপরে যার বন্ধন মজবুত। একবার যদি পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়, তাহলে সামাজিক অবক্ষয় অনিবার্য। সাম্যবাদ বা সমাজবাদের মত মতাদর্শ, যা ধর্মহীনতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তা পরিবারকে তার শিকারের প্রথম লক্ষ্যবস্তু করে নেয়। সেখানে লক্ষ্য থাকে বিবাহের মত প্রতিষ্ঠানকে নির্মূল করা; এবং মাতৃত্বের ন্যায় মূল্যবান স্বভাব-প্রকৃতি, বিশ্বস্ততা, গোপনীয়তা এবং সম্মানের মত মূল্যবোধগুলিতে ভাঙ্গন ধরানো। এভাবে এসব মতবাদের দার্শনিক এবং সমর্থকবৃন্দ এসব মূল্যবোধকে বাজে এবং নিরর্থক বলে উপস্থাপন করে। উদাহরণ স্বরূপ, বিবাহ বহির্ভূত একত্রে বসবাস সমাজ কর্তৃক সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অথচ আজ এটাকে সাধারণ ব্যাপার মনে করা হয়। তাছাড়া, বিবাহবহির্ভূত একত্রে বসবাসকারী ব্যক্তিদের গড় বয়স (অর্থাৎ যে বয়সে লিভ টুগেদার শুরু হয়) কমেই চলেছে।

বিবাহের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণতঃ ভ্রান্ত। নারীরা বিবাহকে এক প্রকার জীবন বীমা হিসাবে দেখে থাকে। এই ধারণা মনে রেখে, তাদের মৌলিক মানদণ্ড হয়ে পড়ে অর্থ-সম্পদ। কখনো, কখনো সামাজিক অবস্থান, সৌন্দর্য এবং পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে। মানদণ্ড হিসাবে সবচেয়ে বেশি বিবেচিত হয় অর্থ-সম্পদ। বিস্ময়ের কিছু নেই, ফুলে ফেঁপে ওঠা বিবাহ-বিচ্ছেদের হার সেই সব বিবাহের অন্তঃসারশূণ্যতা প্রকাশ করে, যার ভিত্তি হল অসার বিষয় যেমন, অর্থ, সম্মান কিংবা চেহারা।

বিবাহের আরেক সাধারণ ভীতি হল স্ত্রীর নিকট পুরুষের প্রত্যাশা। সাধারণভাবে একজন পুরুষ তার বিবাহের জন্য সুন্দর চেহারাকে অতি আবশ্যক জ্ঞান করে। উচ্চ শিক্ষা, বিভিন্ন রকম নৈপুণ্য– এগুলিও একজন পুরুষের সিদ্ধান্ত গ্রহনকে প্রভাবিত করে। নিঃসন্দেহে, দম্পতিরা পরস্পরের মধ্যে যেসব "সম্পদ" তালাশ করে, তার অধকিারী হওয়া দোষের কিছু নয়। তবে বিবাহ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু তা যদি কেবল এই বিষয়গুলির উপরে ভিত্তিশীল হয়, তাহলে এসব বিষয়ের কোন একটার অভাব পরিলক্ষিত হলে পরিবারের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বিবাহের দাবী হল বিশ্বস্ততা, ভালবাসা এবং সম্মান, এমন সব ধারণা যা ধর্মের মাধ্যমে বন্ধনমূলক এবং দৃঢ় মূল্যবোধ হয়ে ওঠে । ফলতঃ ধর্মই কেবল নিশ্চিত করে যে, বিবাহ টেকসই হবে।

এই ধরণের অযৌক্তিক উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত বিয়েতে সাধারণতঃ একটি শক্তিশালী ভিতের অভাব থাকে। পরিণামে, দম্পতি অল্পকালের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, সম্মান এবং অন্তরঙ্গতা হারিয়ে ফেলে। এক সাথে বসবাস আরম্ভ করতে না করতেই তারা একে অপরের নেতিবাচক দিকগুলো দেখতে শুরু করে। এর পথ ধরে আসে তর্ক-বিতর্ক, মারপিট এবং গুরুতর অভিযোগ। কিছুকাল পরে, তারা বাস্তবতাকে মেনে নেয় এবং অন্য লোকদের মত একই রকম অশুভচক্রের অভিজ্ঞতা নেয়। এসব পরিবারের সন্তানেরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। নতুন প্রজন্ম তাদের মাতা-পিতার দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে ভালবাসা ও সম্মান বিবর্জিতভাবে।

যেসব সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ পথ-নির্দেশক হিসাবে অনুসরণ করা হয় না, সেখানে পারিবারিক বন্ধন প্রায়শঃ ভেঙ্গে যায়। পরিবারের নিকটতম সদস্যদের মধ্যে টাকা-পয়সা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে । একজন মুক্তহস্ত স্বামীকে সব সময় তার স্ত্রী ভালবাসে, সন্তানেরা সম্মান করে– তার টাকা-পয়সাকে ধন্যবাদ। এরকম ভালবাসায় কতটা আন্তরিকতা আছে, তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ। যদি একদিন ঐ পিতা তার ব্যবসায়িক সঙ্কটের কারণে পরিবারকে যথাযথভাবে ভরণ-পোষণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই ভালবাসা এবং সম্মান হঠাৎ করেই ক্রোধে রূপ নেয়। টাকা-

পয়সা হল পরিবারের দুশ্চিন্তা এবং দন্দ্বের এক নিত্য কারণ। স্বামী দেউলিয়া হয়ে গেলে, কিংবা আগের মত উপার্জন করতে না পারলে তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে যাবে না– এর কোন নিশ্চয়তা নেই। এ-ধরণের পরিস্থিতিতে সচরাচর বৈবাহিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কুরআনের নীতি অনুসারে জীবন যাপন না করার এটা এক নিশ্চিত পরিণতি ।

একজন বিশ্বাসী বিবাহকে যে চোখে দেখে, তা একজন অবিশ্বাসীর দৃষ্টিকোণ্ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মৃত্যুর পরে এক অনন্ত জীবন অপেক্ষা করছে– এই ব্যাপারে সচেতন থাকায় একজন বিশ্বাসী অনন্তকালের জন্যই বিবাহিত থাকতে চায়। এধরণের একজন ব্যক্তি তার সম্ভাব্য স্বামী বা স্ত্রীর কাছে যা আশা করে, তা হল কেবল আল্লাহর নৈকট্য। অন্য কথায়, যে ব্যক্তির সঙ্গে সে অনন্ত কাল থাকবে, তাকে কুরআনী জীবন যাপন করতে হবে। কারণ, এটি জানা কথা যে, এই জগতে মানুষ যেসব গুণাবলীর অধিকারী, তা ক্ষণস্থায়ী। যেখানে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই কুরআনকে একমাত্র পথনির্দেশক হিসাবে গ্রহন করে, সেখানে তাদের সমগ্র বিবাহিত জীবনে ভালবাসা এবং সম্মান বিরাজ করে। স্বামী-স্ত্রীর জীবন হয়ে ওঠে এক চমৎকার ঐকতান। যদি ঘটনাক্রমে তাদের একজন ভুল করে, তাহলে অপরজন তাকে আল কুরআনের মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এভাবে সমস্যাটার সমাধান হয়। কারণ, একজন বিশ্বাসী এই আহ্বানে সাড়া দেবে না এমনটি সম্ভব নয়। উল্লেখিত এসব কারণে, আল্লাহর উপরে বিশ্বাস এবং ভীতি আছে যাদের, তারা তাদের বিবাহকে মজবুত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করে।

কিন্তু পরিবারের ধারণাকে কেবল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যথার্থ নয়। শিশুরা তাদের মাতা-পিতা এবং পরিবারের বয়স্কদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে, তা-ও গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিবেশে ধর্মীয় নিয়ম-নীতি বিরাজ করে, সেখানে ভালবাসা এবং সম্মান এসব সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। কথাবার্তার রূঢ় এবং শ্রদ্ধাহীন ধরণ, চিৎকার, মারামারি, যা প্রায় প্রতিটি সংসারে সাধারণভাবে লক্ষ্যনীয়, এগুলো (ধর্মীয় পরিবারে) একেবারেই অনুপস্থিত। বরং এখানে শান্তি এবং আনন্দ বিদ্যমান থাকে; কোন পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবারের প্রতি যত্নশীল; এটা

তুলনাবিহীন পারিবারিক জীবনের নমুনা পেশ করে। সন্তানেরা তাদের মাতা-পিতাকে আশীর্বাদ মনে করে এবং তাদের প্রতি খুবই আকৃষ্ট থাকে। তেমনিভাবে, মাতা-পিতা সন্তানকে আল্লাহ্‌র মনে করে থাকে।"পরিবার" অর্থ উষ্ণতা, ভালবাসা, বিশ্বাস এবং একাত্মতা। তবুও, আরো একবার জোর দিয়ে উল্লেখ করা উচিত যে, এরকম এক সুসংহত পারিবারিক পরিবেশ দাবী করে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি পূর্ণ আন্তরিক নিষ্ঠা এবং আল্লাহর প্রতি গভীর ভীতি এবং ভালবাসা।

সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভালবাসা এবং সম্মানের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ মানুষের উপরে বিশ্বাসহীনতার অবস্তুগত প্রভাবের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, অবিশ্বাসীরা সত্যিকারের ভালবাসা এবং সম্মান দিতে জানে না। যে সমাজ এরকম লোক নিয়ে গঠিত, সেখানে নিশ্চিতভাবেই এর সদস্যরা, যুবক কি বৃদ্ধ, গ্রামবাসী বা নগরবাসী, একে অপরকে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে পারে না। এসব পরিস্থিতিতে, একজন ব্যক্তি প্রায়শঃ নিঃসঙ্গ বোধ করে এবং সন্দেহ করে যে, তাকে কেউ ভালবাসে না। প্রত্যেকেই কেবল নিজের কথা ভাবে। যে ভালবাসা এবং সম্মান তারা একে অপরের জন্য আছে বলে মনে করে, তা আসলে কুরআনে বর্ণিত ভালবাসা বা সম্মানের অনুরূপ নয়। এর মূল কারণ হল, তাদের সমস্ত মূল্যবোধ স্বার্থ-তাড়িত বিষয়ে উপরে ভিত্তিশীল।

কেউ অন্যকে সম্মান করে না– সে স্রেফ এমনটিই অনুভব করে। একজন চাকুরিজীবী জানে যে, তাকে তার কর্মকর্তাকে সম্মান করতে হবে, অন্যথায় তাকে চাকুরিচ্যুত করা হবে। একজন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে তার শিক্ষককে সম্মান করতে হয়, নইলে সে হয়ত ক্লাসে অকৃতকার্য হতে পারে। তেমনিভাবে, একজন নারী তার স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহারের তাগিদ অনুভব করে এই ভয়ে যে, সে তার ব্যয় নির্বাহ বন্ধ করে দিতে পারে। কাজেই, এটা সম্পূর্ণ পরিস্কার যে, এসব উদাহরণে উল্লেখিত সম্মানের পিছনে রয়েছে স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা।

যাহোক, কুরআনের নৈতিকতায় যাপিত জীবনে আপনি কখনো এরকম অবস্থা লক্ষ্য করবেন না। একজন বিশ্বাসী, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় এবং তাঁকে ভয় করে, তাকে সকলেই সম্মান করে। শ্রদ্ধার পাত্র হবার জন্য তাকে কীর্তিমান কিংবা বিত্তশালী হবার প্রয়োজন পড়ে না। অন্যের ভালবাসা এবং সম্মান অর্জনের জন্য কেবল বিশ্বাসী হওয়া, আল্লাহর ভয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই যথেষ্ট

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা অবিশ্বাসীদের সমাজে বিদ্যমান নৈতিকতা এবং চেতনার ধরণ উল্লেখ করেছি। এখন, এরকম লোক নিয়ে গঠিত এমন এক সমাজের কথা ভাবুন । এই ধরণের সমাজে কি ভালবাসা এবং সম্মান বিরাজ করতে পারে? নিশ্চয়ই না। যে ব্যক্তি আপন সৃষ্টিকর্তা এবং পরম অনুগ্রহকারী আল্লাহর প্রতি ভয় বা ভক্তি প্রদর্শন করে না, সে স্বভাবতঃই তার কর্মচারীদেরকেও কখনোই ভালবাসতে পারে না। এই সমাজের জন্য একমাত্র সমাধান হল এমন এক সমাজ, যেখানে মানুষ ধর্মীয় নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে।

মদ-জুয়ার আতঙ্ক নির্মূল হয়ঃ যে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ অবহেলিত, সেই সমজের যে দুঃখজনক জিনিসটা মনে সবচেয়ে বেশি রেখাপাত করে তা হল, অধিকাংশ লোকের মদ্যপান এবং জুয়া খেলা। এই দুটো কাজ জীবনের অংশে পরিণত হয়। ইসলামের নীতি অনুসারে জীবন যাপন না করায় এই সমাজের সদস্যরা জানে না ধৈর্য্য কি, আশা কি, কিংবা আল্লাহতে বিশ্বাস কি। সেজন্য যখনই তারা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তখন তারা সর্বপ্রথম মুক্তি খোঁজে মদ বা জুয়ার মধ্যে ।

যখন সবকিছু কাঙ্খিত পন্থায় না ঘটে, যখন তারা রেগে যায়, বিরক্ত, কিংবা দুঃখিত হয়। এমনকি যখন তারা উৎফুল্ল হয়, তখনও তারা এ্যালকোহলের স্মরণাপন্ন হয় এবং তাদের নিজস্ব উপায়ে তারা "স্বস্তি লাভ করে"। যাহোক, এটা করে তারা নিজেদের এবং অন্যদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করে না। যখন তারা বেশি পান করে, তখন তাদের সচেতনতা লোপ পায়– এটা এমন এক অজুহাত যা তাদের সব দোষ ক্ষালন করে। তারা মানুষকে বিরক্ত করতে কোনরূপ বিব্রতবোধ করে না এবং সমাজে অন্যায়

আচরণ করে । সুন্দরভাবে দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করতে পারার যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে অন্য সময় মদ্যপ অবস্থায় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে মানুষ অবাক হয় না।

মদ্যপ অবস্থায় চেতনা হারানোর পরিণামে যত খারাপ কিছু ঘটুক, এটা যে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত। উদাহরণ স্বরূপ, একজন লোকের সমস্ত সম্পদ এক রাত্রের জুয়া খেলায় হারিয়ে বসা, কিংবা মদপান করার পর খুন, সহিংসতা, আত্মহত্যা ইত্যাদি করে ফেলা দুর্লভ কোন ঘটনা নয় । এসব অশুভ বিষয়ের উল্লেখ নিম্নলিখিত আয়াতে করা হয়েছেঃ

"ওহে বিশ্বাসীগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়ের তীর– এসব নোংরা ও অপবিত্র, শয়তানের কাজ ব্যতীত কিছুই নয়। সুতরাং তোমরা এসব বর্জন কর; আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায়। তবুও তোমরা কি এসবত্যাগ করবে না?" (সূরা মায়িদাঃ ৯০-৯১)

যেহেতু সত্যধর্ম জুয়াকে নিষিদ্ধ করে, সেহেতু বিশ্বাসীরা এটা থেকে অনেক দূরে থাকে। তাদের হৃদয়ের আল্লাহ-ভীতি এই বর্জনের নিশ্চয়তা দেয়। পরিণতি যা-ই হোক, যত উদ্বুদ্ধকারী বা প্রলুব্ধকারী মনে হোক, তারা পরাজয় মানে না। ধর্মের অবস্থান থেকে, এর সপক্ষে উল্লেখ করার মত কোন অজুহাত বা সঙ্গত কারণ নেই। কেউই অজুহাত খোঁজার মত অনৈতিকতা দেখায় না। কারণ, ধর্ম কোন অবৈধ কাজে নমনীয়তা বা শৈথিল্য মেনে নেয় না।

মানুষ যখন ধর্মীয় নীতি অনুসরণ করে না, তখন তাদের মূল্যবোধ এবং বিচারবুদ্ধির প্রকৃতি হয় অনির্ভরযোগ্য। কারণ, সময়, পরিস্থিতি এবং সহযোগীদের সঙ্গে সঙ্গে তারা পরিবর্তিত হয়। এসব বাস্তবতার উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যার উদ্ভব ঘটে। জুয়া এবং এরকম অন্যান্য অপকর্ম কোন কোন স্থানে অগ্রহনযোগ্য হতে পারে। তবে এমনকি যারা এটা মন্দ বিবেচনা করে, তাদের দৃষ্টিতেও এটা হোটেলের মত কোন

বিশেষ স্থানে সংঘটিত হলে আপত্তিকর মনে না হতে পারে। এমনকি একজন ব্যক্তি নীতিগত কারণে জুয়া খেলে না, সে-ও "উপযুক্ত" স্থান পেলে এতে অংশগ্রহন করতে দ্বিধা করবে না।

যদি কোন কিছু মন্দ বা অনৈতিক হিসাবে বিবেচিত হয়, তাহলে এটাকে সকল পরিস্থিতিতে কঠোভাবে বর্জন করা উচিত। সঙ্গী বা পরিস্থিতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করাটা দুর্বল চরিত্রের সুস্পষ্ট লক্ষণ। যে ব্যক্তি ধর্মীয় নৈতিকতার ব্যাপারে অসচেতন, সে দৃঢ় মনোবল বা ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করবে– এটার সম্ভাবনা কম।

মাদক সমস্যা দূর হবেঃ একটি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ একটি প্রতিবেদন তৈরি করে, যেখানে দেখা যায়, পৃথিবীতে ২০০ মিলিয়ন লোক মাদক ব্যবহার করে। প্রতিদিন খবরের কাগজ এবং টেলিভিশন মাদকাসক্তি এবং মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ প্রচার করে। এসব সংবাদ এক ভাবে, আমাদের মনকে অসাড় করে দেয়, আমাদেরকে ভাবিত করে। এটা মোটেই সাধারণ ব্যাপার নয়। কিন্তু এসব ক্ষতিকর দিক নিয়ে গভীর চিন্তা আমাদেরকে এর গ্রহনযোগ্যতার দুর্বলতা সম্পর্কে আরো ভাল উপলব্ধি দেয় । এটা কি গ্রহনযোগ্য যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সচেতন প্রাণি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কয়েক মিলিগ্রাম বস্তুর নিশ্চিত আসক্তির উপরে নির্ভরশীল হয়ে যাবে? যখন এটা থেকে বঞ্চিত হবে, তখন সচেতনতা হারিয়ে ফেলবে, এমনকি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়বে?

যারা মাদকাসক্ত, তারা প্রায়শঃ প্রাথমিক ডোজ নেয় এই বলে যে, "মাত্র একবারের জন্য নিলে কিছুই হবে না।" সচেতনভাবে কিংবা অসচেতনভাবে, এই লোকেরা প্রায়ই বিদ্রোহী প্রকৃতি গড়ে তোলে। তারা সাধারণতঃ তাদের আসক্তির ব্যাপারে 'যুক্তিসঙ্গত' অজুহাত দাঁড় করায়, যেগুলো, বলাবাহুল্য, অন্তঃসারশূণ্য। তাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা দুর্বল ইচ্ছাশক্তি অগ্রাহ্য করে তারা সমস্ত দোষ তাদের আশেপাশের লোকদের উপরে আরোপ করে। পারিবারিক সমস্যা, বিদ্যালয় বা ব্যবসায় জীবনের ব্যর্থতা, সামাজিক জীবনে বিবাদ, আর্থিক সমস্যা, সবকিছু ঠিকমত না চলা কিংবা কোন না কোন কারণে

বিষণ্নতা– এগুলো প্রায়শঃ তাদের পথ হারানোর যথেষ্ট কারণ হিসাবে দেখা হয়। একবার যদি তারা এই চেতনার দ্বারা কবলিত হয়ে পড়ে, তাহলে তারা এক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে এবং আরো বড় অন্ধকার এবং নেতিবাচক অবস্থায় পতিত হয়।

জীবনের জটিলতার সম্মুখীন হলে তারা দুর্বল বোধ করে। তারা যেহেতু আপন স্রষ্টাকে বন্ধুরূপে দেখে না, সেহেতু তারা আস্থা স্থাপন করার মত কাউকে পায় না। তারা সবকিছু ভুলে যাওয়া এবং চেতনা লোপ করার মধ্যে সমাধান তালাশ করে। এই বিষয়টা মনে রেখে তারা প্রতিদিন মাদক গ্রহনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করতে থাকে। তাছাড়া, মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনে বিশ্বাস না থাকায় এবং মৃত্যুকে জীবনের সমাপ্তি বিবেচনা করায় তারা জীবনকে যথাসাধ্য উপভোগ করতে চায়। কিন্তু তারা আতঙ্কিত বোধ করে, কারণ, যে জীবনকে তারা উপভোগ করতে চায়, তা তাদের জন্য দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা অচল অবস্থার সম্মুখীন হয়। কারণ, দৈনন্দিন জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলো তাদেরকে ভারাক্রান্ত করে তোলে এবং তাদের শারীরীক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটায়।

উত্তেজনা এবং ক্রোধের এই ভয়ানক মনোভাব, যার অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করে, বাস্তবে তা হল এই জগতে বিবেকবানের মত আচরণ না করে– আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে তাদের নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্খা অনুসরণের পরিণাম।

আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি এবং বিবেক দিয়েছেন এবং তাকে এই পৃথিবী এবং পরজগতের সুখময় জীবনের ওয়াদা করেছেন এই শর্তে যে, সে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে। অন্যথায় তার জন্য যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে এই জীবনে এবং পরকালে। সত্যটা হল এই যে, কেবল যারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চায়, তারা বেহেশতের অনন্ত সুখের জীবন এবং এই জগতে শান্তিপূর্ণ, আরামদায়ক জীবন লাভের আশায় নিরাপদ বোধ করে ।

আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য হল নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে বড় অবলম্বন যা কেউ কখনো লাভ করতে পারে। এই কারণে

বিশ্বাসীরা হয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাদের ইচ্ছাশক্তি এবং সজাগ চেতনা থাকে। তারা দুর্বলতা প্রদর্শন করে না এবং অন্তরে দুর্বলতাকে স্থান দেওয়াকে যথার্থ মনে করে না। যে জিনিসটা তাদেরকে এত শক্তিশালী এবং দৃঢ়চেতা করে, তা হল, আল্লাহর উপরে গভীর বিশ্বাস এবং তাঁর প্রদত্ত ধর্মের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা।

কোন পতিতাবৃত্তি থাকে নাঃ "ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না। এটা অশ্লীল আচরণ এবং মন্দ পথ।" (সূরা আল ইসরাঃ ৩২)

ব্যভিচার হল কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঘন্য কর্মগুলোর একটা এবং গুরুতর অপরাধ। অনুতপ্ত না হলে এটা মানুষের অবক্ষয় ঘটায় এই জীবনে এবং পরজীবনে।

ব্যভিচার এবং পতিতাবৃত্তি সমাজে অসংখ্য অকল্যাণের কারণ, সেই সাথে যারা এটা সংঘটিত করে, তাদেরও। আল্লাহ এটা নিষিদ্ধ করেছেন– বিশ্বাসীদের জন্য এটা বর্জন এবং ঘৃণা করার এটাই যথেষ্ট কারণ। এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেছেন যা ধর্মের দৃষ্টিতে বৈধ।

তাছাড়া, পতিতাবৃত্তি সমাজের যে সুস্পষ্ট ক্ষতি করে, তা লক্ষ্য করে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আরো মজবুত হয়ে যায়। বিশ্বাসীরা সচেতনভাবে লক্ষ্য করে, আল্লাহকর্তৃক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত এই কাজ যারা অবিরাম করতে থাকে, তাদের জীবনে কি ঘটে।

পতিতাবৃত্তির কারণে আজ অনেক লোক তাদের সম্মান, আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ হারিয়ে অবমাননাকর জীবনধারায় ফিরে গেছে। পতিতাবৃত্তি অনেক পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং জীবনে দুঃখ ও অশান্তি এনে দিয়েছে। এটার সাথে যুক্ত হয়েছে তাদের মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা। যাহোক, আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে যদি তারা বৈধ কর্মগুলির আনুকূল্য করত, তাহলে তারা এক শান্তিপূর্ণ মানসিক অবস্থা অর্জন করতে পারত, আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে পারত এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্মান নিশ্চিত করতে পারত। এতে করে সুসংহত পরিবার এবং সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব হত।

সামাজিক অবক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় পতিতাবৃত্তির তর্কাতীত ভূমিকা রয়েছে। কারণ, এর লক্ষ্যবস্তু হল পরিবার নামক সমাজের সারবস্তু। পতিতাবৃত্তি দ্বারা বিধ্বস্ত সমাজ-সদস্যরা আত্মসম্মান এবং চারপাশের মানুষের সম্মান– উভয়টিই হারায়। এটা চিন্তা করা ভুল হবে যে, মানুষ কেবল অর্থের প্রয়োজনে পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। প্রায়শঃ এর সাথে ব্যক্তিগত সুবিধা জড়িত থাকে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী যা-ই হোক না কেন, এটা পতিতাবৃত্তিই। এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণতঃ এই কথা বলে মনকে প্রবোধ দিতে চায় যে, এই সম্পর্কের মাধ্যমে তারা "কোন বস্তুগত সুবিধা আশা করে না"। তবে এটা আসলে এটা এক বড় ধোঁকা, কারণ, একবার যখন কেউ আল্লাহ-নির্দেশিত সীমা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তখন আর কোন বৈধ কাজের কথা বলা বাস্তবসম্মত হয় না। কুরআনে আল্লাহ আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, বিবাহ-বহির্ভূত যে কোন যৌন সম্পর্কই অবৈধ। সেই কারণে, আমরা পতিতাবৃত্তিকে কোন বিশেষ ছাঁচের মধ্যে এ সীমাবদ্ধ করতে পারি না।

এটা ছাড়াও, পতিবৃত্তি অবৈধ– এই ব্যাপারে সচেতন হওয়ায় যারা এই পাপ করে, তাদের অধিকাংশই অন্তরের গভীরে যাতনা ভোগ করে, বিবেকের তীব্র দংশন এবং বিরাট অস্বস্তি বোধ করে। এমনকি যদি তারা এটা অস্বীকারও করে, তবু তারা যে আত্মবিশ্বাস হারায়– এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আরেকটা ক্ষতি যা পতিতাবৃত্তি সমাজে করে থাকে তা হল, কেবল এই উদ্দেশ্যেই বিশেষ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা। পতিতাবৃত্তি যত বিস্তার লাভ করে, এসব অঞ্চলের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পায় এবং সমাজকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যুব সম্প্রদায় এসব অঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হয়, পরিবারের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে এবং এভাবে বিশ্বাসহীনতা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়। যাহোক, আল্লাহ মানুষকে এমন পরিবেশের দিকে আহ্বান করেন, যেখানে নিরাপত্তা, বিশ্বস্ততা এবং আস্থার প্রাধান্য থাকে। তিনি এই সমাজকে তাঁর অনুগ্রহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্ব ইতিহাস ব্যাপী, অনেকে পতিতাবৃত্তিকে জীবিকা অর্জনের পথ হিসাবে এবং এভাবে নিজেদেরকে অপমানিত করাটাকে বেছে নিয়েছে। আজকের দিনেও পতিতাবৃত্তিকে অর্থ

উপার্জনের এক সহজ পথ হিসাবে পেশ করা হয়। বিলাসী জীবনযাত্রা এবং বেশি রোজগারের আশায় অনেকে অবমাননাকর জীবনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, আল কুরআনে আল্লাহ এই বিপদের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেনঃ

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও করুণার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারাঃ ২৬৮)

যাহোক, কেউ যদি আল্লাহকে তার রক্ষাকর্তা হিসাবে আশা করে এবং বিশ্বাসী হবার সম্মান লাভ করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম জীবিকা দান করবেন, তাকে অনেক সুযোগ দেবেন এবং এভাবে তাকে আপন অনুগ্রহে ধনবান করবেন। আল্লাহর ইচ্ছাতে একজন সম্মানীয় এবং নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী এই দুনিয়ায় এবং পরলোকে অনেক অনুগ্রহ লাভ করে। যাহোক, পরীক্ষা স্বরূপ আল্লাহ তাকে সীমিত সম্পদ দান করতে পারেন। এরকম ক্ষেত্রে, যদি সে এই পৃথিবীর নশ্বরতার কথা বিবেচনা করে, তাহলে বুঝবে, আল্লাহ তাকে অনেক অনুগ্রহ করেছেন।

স্মরণ রাখা দরকার, কেউ এই জগতে যে কোন ধরণের ভুল করতে পারে। এটা খুবই সম্ভব যে, কেউ এমন পাপ করল যা আল কুরআনে গুরুতর মনে করা হয়, কিংবা কেউ জীবনের দীর্ঘ সময় পতিতালয়ে কাটালো, কিংবা অন্য কোন ধরণের অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করল। তবে কাউকে যখন সত্যপথে আহ্বান করা হয়, তখন যদি সে আল্লাহর দিকে আন্তরিক অনুতাপসহ প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সে আল্লাহকে অনুতাপ শ্রবনকারী হিসাবে পাবে। এই বাস্তবতাও বিবেচনা করা উচিত যে, মৃত্যু আসন্ন দেখে মনে আসা আন্তরিকতাশূন্য অনুতাপ আল্লাহ গ্রহন করেন না। আল্লাহ এটা কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেনঃ

"আল্লাহ তাদের অনুতাপ গ্রহন করেন, যারা না জেনে অন্যায় করে বসে; আবার সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর তওবা তাদের জন্য নেই যারা অন্যায় করতেই থাকে। এমনকি যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে, তওবা করলাম; আর

তাদের জন্যও তওবা নয়, যারা মৃত্যুবরণ করে কাফির অবস্থায় । আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" (সূরা নিসাঃ ১৭-১৮)

কেউ আইন-বিরুদ্ধ জীবন যাপন করে নাঃ আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কিভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়া লোকেরা পরলোকের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস পোষণ করে না। তারা এই জীবনের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে এবং তাদের আকাঙ্খা অনুসরণে কোন সীমারেখা মানে না। এসব লোক তাদের প্রবৃত্তির পিছনে ছুটতে গিয়ে যে কোন কাজ করতে পারে, এমনকি সম্মানও হারাতে পারে। তাদের বিকৃত যুক্তিধারা অনুযায়ী, তারা শেষ পর্যন্ত মারা যাবে এবং ধূলায় মিশে যাবে। অতএব, তাদেরকে এই জীবনটা সর্বোত্তম উপায়ে উপভোগ করতে হবে, কারণ, এই জীবন সংক্ষিপ্ত। তারা অর্থ-সম্পদকে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত করে। কারণ, তারা এটাকে এই জগতের যে কোন ধরণের সফলতার চাবিকাঠি মনে করে। তাদের নিজস্ব চিন্তামতে, টাকা থাকলে সে ইচ্ছামত যে কোন জিনিস অর্জন করতে পারে। আসলে এটাই সেই বিষয়, যেখানে তারা তাদের নৈতিক দুর্বলতা প্রদর্শন করে। তারা অর্থ লাভের জন্য যে কোন কিছুতে জড়িত হতে পারে, কেবল যদি তারা কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য না হয়।

এরকম লোকের যে কোন ধারণাযোগ্য অপরাধের প্রবণতা থাকে, যেমন- প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, জুয়াচুরি, চুরি, আত্মস্মাৎ এবং মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান। দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে এরকম খবরের আধিক্য এই ব্যাপারটা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। আমরা সবাই সম্পত্তির লোভে খুন করার গল্পের সাথে পরিচিত, কিংবা অর্থের লোভে স্ত্রী, কন্যা বা প্রতিবেশীকে পতিতাবৃত্তিতে উৎসাহিত করা, কিংবা কোন না কোন প্রবঞ্চনার কথা শুনে থাকব।

যাহোক, বিশ্বাসীদের এই সচেতনতা থাকে যে, রিযিকদাতা আল্লাহ অভাবীদেরকে জীবিকা দান করেন। সন্দেহ নেই, আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় তারাও জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজ করে। তবে তারা পার্থিব বস্তুর জন্য উচ্চাকাঙ্খী নয় এবং

অবৈধভাবে জীবিকা উপার্জনের কথা কল্পনাও করে না। তারা জানে যে, কেবল সততার মধ্য দিয়ে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন সম্ভব, যেমনটি মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ সেই সব বিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন, যারা বৈধপন্থায় পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে।" (তাবারি)। পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট না হবার বিনিময় হিসাবে তারা অসীম অনুগ্রহ লাভ করে। মানুষের প্রকৃত বাসস্থান যে পরলোকে– এই ব্যাপারে সচেতন হওয়ায় তারা জানে যে, যদি তারা সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়, তারা পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত এবং অনেক অনুগ্রহ লাভ করবে।

মানুষ যখন ইসলামি নৈতিকতা মেনে চলে, তখন সমাজ কিভাবে রূপান্তরিত হয়?
ধর্মীয় মূল্যবোধের অস্তিত্ব আল্লাহর প্রতি ভালবাসার জন্ম দেয়। মানুষের উপরে এই ভালবাসার এক অভিভূত করার মত ইতিবাচক এবং উৎসাহমূলক প্রভাব পড়ে । আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য বিশ্বাসীরা সবচেয়ে নৈতিক পন্থায় নিজেদেরকে প্রবোধ দেয়; তারা একে অপরকে ভালবাসে এবং সম্মান করে। সাধারণভাবে, করুণা, সহনশীলতা এবং সহানুভূতি সমাজে পরিব্যপ্ত থাকে। আল্লাহর নির্দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে মানুষ ভাল কাজে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

বিপরীতক্রমে, আল্লাহ-ভীতির কারণে মানুষ কঠোরভাবে অনৈতিক বা মন্দকাজ বর্জন করে চলে। এইভাবে, সব রকম মন্দকাজ যা আগে বর্জন করা সম্ভব ছিল না, তা সহসা বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মের উষ্ণতা এবং চেতনা জীবনের প্রতিটি দিক-বিভাগকে প্রভাবিত করে। নিশ্চিতভাবে, ধর্ম বলতে এখানে কুরআনে অবতীর্ণ প্রকৃত বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা সহকারে এটার অনুসরণকে বুঝানো হয়েছে ।

কোন সমাজের কাঠামো এবং টিকে থাকার ক্ষেত্রে পরিবার মূখ্য ভূমিকা পালন করে। যেখানে মানুষ সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে, সেখানে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় এবং প্রকৃত ভালবাসা ও সম্মান অর্জিত হয়। পরিবারের অনুপস্থিতিতে, রাষ্ট্রের ধারণাও অর্থ হারিয়ে ফেলে। এগুলি আসলে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারণা। পরিবারের ধ্বংস সমাজের এবং রাষ্ট্রের

সর্বনাশ ঘটায়। যেসব সমাজে ধর্ম জোরালো ভূমিকায় নেই, সেখানে মানুষ স্বেচ্ছাচারী এবং উচ্ছৃংখল হয়ে পড়ে এবং আপন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। যেসব পরিস্থিতিতে নৈতিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করতে হয় এবং রক্ষা করতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি ভীতিহীন ব্যক্তিরা এই লক্ষ্যে কোন প্রচেষ্টা চালায় না। মাঝে মাঝে যখন সামাজিক উদ্দেশ্য ব্যক্তি-স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন এটা অবশ্যম্ভাবী যে, ধর্মীয় মূল্যবোধ-বিবর্জিত লোকেরা তাদের নিজেদের আকাঙ্খার অনুকূলে যেতে দ্বিধা করে না– তারা শাসক হোক বা শাসিত। এটাও বিবেচনা করা উচিত, সময় এলে একজন তার নিজের লোকদের সেবা করার ব্যাপারটি কৌশলে এড়িয়ে যাবে– এমন সম্ভাবনা রয়েছে। এ-ধরণের লোকের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যোগ দেয়া আদৌ বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। তবে যে ব্যক্তি ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে জীবন যাপন করে, তার কাছে রাষ্ট্রের নির্দেশ অনেক উচ্চে। যদি প্রয়োজন পড়ে, সে তার জীবনও এসব মূল্যবোধের জন্য বিপন্ন করবে। এরকম একজন ব্যক্তির জন্য, তার রাষ্ট্রের স্বার্থ সব সময় তার নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকবে।

যে সমাজে ধর্মীয় অনুভূতি বিরাজ করে, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরাও রাষ্ট্রের প্রতি ভালবাসা এবং সম্মান বোধ করে। এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা করার পরিবর্তে তারা একে সমর্থন প্রদান করে। তারা সৈনিক কিংবা পুলিশকে আক্রমন করে না, অধার্মিক হলে যেমনটি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে, তারা (সৈনিক ও পুলিশ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে– এটা বিবেচনা করে তারা (ছাত্ররা) তাদেরকে সম্মান ও সমর্থন করে। সাধারণভাবে সমাজের লোকেরা রাষ্ট্র, সেনাবাহিনী এবং পুলিশের প্রতি আস্থা রাখে এবং তাদের পাশে দাঁড়ায়। ছাত্রদের বিদ্রোহ, ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, ডানপন্থী-বামপন্থী সংঘাত– সবকিছুর সমাপ্তি ঘটে। এর কারণ হল এই যে, বিবাদ করার মত আর কোন ইস্যু অবশিষ্ট থাকে না। প্রত্যেকেই, আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করে এবং তাঁর গ্রন্থে শেখানো নীতি অবলম্বন করে; ফলে দ্বন্দ সৃষ্টি হবার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের স্থানে কল্পনা করার মাধ্যমে অন্যদের উপরে অনুগ্রহ করে এবং সহনশীলতার সাথে সব

সমস্যার মোকাবেলা করে। এভাবে সব সমস্যার সমাধান দ্রুত এবং সর্বোত্তম উপায়ে হয়ে যায়।

এরকম অনুকূল অবস্থায়, রাষ্ট্র পরিচালনা সঙ্গত কারণেই সহজ হয়ে যায়। রাষ্ট্র নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ স্থানে পরিণত হয়। দেশের প্রশাসকগণ নাগরিকদের সঙ্গে ন্যায়বিচারমূলক এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে। এভাবে অবিচারের চর্চা শেষ হয়ে যায়। বিনিময়ে তারা নাগরিকদের সম্মান লাভ করেন। এরকম রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামি নৈতিকতার অনুপস্থিতিতে, পিতা পুত্রের শত্রু হয়ে যায়, পুত্র শত্রু জ্ঞান করে পিতাকে, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিবাদ হয়, মালিকেরা শোষণ করে তাদের শ্রমিকদের। সামাজিক অরাজকতা সমাজের সকল ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে, কল-কারখানা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় অরাজকতার কারণে এবং বিত্তশালীরা দরিদ্রদের শ্রমের ফায়দা ওঠায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জগতে একে অপরকে প্রতারিত করতে চেষ্টা করে। বিশৃংখলা, সংঘাত এবং অরাজকতা সমাজের লোকদের জীবনযাত্রায় পরিণত হয়। এসব কিছুর কারণ হল, মানুষ আল্লাহকে ভয় করে না। আল্লাহর ভয়শূণ্য এসব মানুষ অবিচার করতে নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করে এবং সহিংসতার চূড়ান্ত করতে, নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে– এমনকি খুন-খারাপি করতেও দ্বিধা করে না।

তাছাড়া, বিবেকের দংশন বোধ না করায়, তারা প্রকাশ্যে তাদের অনুতাপহীনতার কথা প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাকে দোজখে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে, সে কখনো এরকম কাজ করে না। আল কুরআনের নীতিশিক্ষা এসব অপ্রীতিকর কার্যকলাপকে অসম্ভব করে তোলে। সবকিছুই সহজে ধীর-স্থিরভাবে এবং সবচেয়ে ভাল উপায়ে পরিচালনা করা হয়। কোন বিচারিক ভুল হয় না; থানা এবং আইন-আদালত কোন মামলা পায় না বললেই চলে।

সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের স্বস্তি ও শান্তিপূর্ণ মানসিকতা মোটের উপরে সমাজে সমৃদ্ধি এনে দেয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যাপকতা লাভ করে। নতুন আবিস্কার কিংবা প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ছাড়া একটি দিনও অতিক্রান্ত হয় না বললেই চলে। এসব কিছুর সুফল সকলের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয় এবং নেতৃবৃন্দ জনকল্যাণকে বেগবান করেন। এই সমৃদ্ধি মানুষের চাপমুক্ত মানসিকতার নিকট ঋণী। একবার যখন কারো মন সুস্থির হয়, তখন তার উন্নততর চিন্তার ক্ষমতা গড়ে ওঠে এবং মনের এই অবস্থা গভীর চিন্তার সুযোগ বৃদ্ধি করে। এর ফল হল, বুদ্ধির পরিস্কার এবং বন্ধনহীন ব্যবহার। নৈতিকতার উন্নত মান অনুযায়ী জীবন যাপন করায় মানুষের সমৃদ্ধি আসে; তারা তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে সফল হয়। কৃষি এবং শিল্প বিকশিত হয়। প্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রেই সত্যিকারের অগ্রগতি সাধিত হয়।

শিল্প-কলার ক্ষেত্রেও বিশাল পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। যেসব লোকের স্বপ্ন নিষ্ফল হয়ে যায় এবং যাদের দিগন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায় দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতের কারণে, তারা ধর্মের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপনের মাধ্যমে এসব সংকট থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নেয়। ফলে মানুষ শিল্পকলায় পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং নিজের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় পরিপূর্ণ করে। যে ব্যক্তি সচেতন যে, আল্লাহ তার মধ্যে তাঁর থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং তাকে এমন চিরস্থায়ী জান্নাতের আশ্বাস দিয়েছেন যা সৌন্দর্য, শিল্প এবং অসীম অনুগ্রহে পূর্ণ, সেই ব্যক্তির নিঃসন্দেহে শিল্প এবং সৌন্দর্যের নিখুঁত অবস্থার চেতনা থাকবে। অন্তরের গভীরে সে এটা থেকে আনন্দ লাভের উপলব্ধি করবে এবং বৃহত্তর উপলব্ধির জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে। তাছাড়া, তার চারিপাশের মানুষের জন্য তার ভালবাসা এবং সম্মান– তাও তাকে সবচেয়ে ভালটি পেশ করতে তার অঙ্গীকার বৃদ্ধি করবে। যে পরিবেশে মানুষ সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এবং কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলে, সেখানে সব রকম শিল্প বিকশিত হয়।

যেসবলোক ধর্মীয় নৈতিকতা অনুসারে জীবন যাপন করে না, তারা নিজের আত্মার উন্নতির ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তারা কখনো তাদের চারিপাশের লোকদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করবার তাগিদ অনুভব করে না। কারণ, তারা নিজেদেরকে বানরসদৃশ

প্রাণি থেকে বিবর্তিত প্রাণি মনে করে এবং মনে করে এক দিন তারা হারিয়ে যাবে। তাদের জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য হল তাদের অনুতাপশূন্য স্বার্থপর জন্তুসদৃশ প্রবৃত্তির আকাঙ্খা মেটানো। যাহোক, প্রবৃত্তির অনুসরণ মানবাত্মার উন্নয়ন ঘটায় না, বরং এটাকে ভোঁতা করে দেয়। এধরণের লোক শিল্পের প্রতি কোন খাঁটি অবদান রাখতে পারে না। তাছাড়া, এটার সম্ভাবনাও ক্ষীণ যে, তারা সত্যিকারের শৈল্পিক সৌন্দর্য মূল্যায়ন করবে কিংবা এর থেকে আনন্দ লাভ করবে। যে দেশে জনসাধারণ শিল্প উপভোগ বা মূল্যায়ন করে না, সেখানে শিল্পীরা সত্যিকার শৈল্পিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। টাকা-পয়সা ও নিজের অবস্থার উন্নয়ন হয়ে পড়ে মৌলিক উৎসাহদায়ক বিষয়। তারা সত্যিকার শিল্প সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

উপসংহারে বলা যায়, যখন মানুষ আন্তরিকভাবে কুরআনে বর্ণিত ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ করে, তখন বর্তমান জীবন এক প্রকার জান্নাতে পরিণত হয়। যে সামাজিক সংহতি মানুষ যুগ যুগ ধরে আকাঙ্খা করে আসছে এবং অর্জন করার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে, যাকে তারা কল্পিত আদর্শ সমাজ হিসাবে দেখে আসছে, এই অসম্ভব স্বপ্ন খুব অল্প সময়ে বাস্তবায়িত হয়।

সমাধান রয়েছে আল কুরআনের মূল্যবোধে

সমস্ত পুস্তকব্যাপী আমরা আলোচনা করেছি ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বহুদূরে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরণধারা নিয়ে। আমরা এরকম লোকদের নিয়ে গঠিত সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছি। আমরা বিশ্লেষণ করেছি সমস্যা ও সঙ্কটজর্জরিত জীবনধারা যা তারা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। এসব সমস্যা দ্বারা সৃষ্ট শারীরীক এবং আত্মিক ক্ষতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাসীদের সুখময় জীবনও চিত্রিত করেছি। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে আলোচিত বিশ্বাসীদের জীবনের শান্তি এবং নিরাপত্তাবোধ হল স্রেফ এই বাস্তবতার পরিণতি যে, আল কুরআন সকল প্রকার সমস্যার সমাধান দেয়। আসলে আল কুরআন যে কোন সমস্যার সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং নিখুঁত সমাধান দেয়, সমাধান দেয় যে কোন অচলাবস্থার।

আল কুরআনের নৈতিকতা অনুসরণ মানবজীবনে সুখ-শান্তি এনে দেয় এবং অবিচার, দন্দ্ব, বৈষম্য, হানাহানি, সীমালঙ্ঘন, উৎকণ্ঠা, গোঁড়ামি, নিষ্ঠুরতা এবং সহিংসতার সমাপ্তি ঘটায়। এটা অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সামাজিক সম্পর্কের দিকনির্দেশনা দেয় এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে, আত্মীয়-স্বজনদের এবং ব্যাপকতর সমাজে বিবাদ মিটিয়ে দেয়। আল কুরআন সবচেয়ে জরুরি, নিখুঁত এবং যুক্তিসঙ্গত সমাধান দেয়।

তাছাড়া, আল কুরআন মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয় আদর্শ মনোভাব এবং নৈতিক কাঠামোর দিকে। এই মনোভাব সে প্রদর্শন করবে যে কোন বিষয়ে এবং যে কোন পরিস্থিতিতে। যে সমাজের সদস্যরা এই শ্রেষ্ঠ নৈতিকতার অনুকরণীয় আদর্শ, তারা নিশ্চিতভাবে সেই আদর্শ সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলবে, যা হাজার বছর যাবৎ মানুষ সন্ধান করে ফিরছে।

আল কুরআন যেসব সমস্যার সমাধান দেয়, তা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছেঃ

“. . . এটা নতুন কোন বর্ণনা নয়, বরং এটা তো পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সমর্থক, সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ এবং যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।” (সূরা ইউসুফঃ ১১১)

ইসলামি মূল্যবোধের দিকনির্দেশনা ছাড়া মানুষ কখনোই ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক সমস্যার সন্তোষজনক এবং টেকসই সমাধান করতে পারে না । আসলে ইতিহাস এমন অসংখ্য সমস্যায় পরিপূর্ণ যা আল কুরআনের নির্দেশনা না মানায় আজো সমাধানহীন রয়ে গেছে। যতদিন মানুষ সত্যধর্মকে অবজ্ঞা করবে, ততদিন সে অনিবার্যভাবে এমন সব সঙ্কট ও সমস্যার সম্মুখীন হবে, যা সে কখনোই সমাধান করতে সক্ষম হবে না। এই জগতে এটাই অধার্মিক লোকদের পরিণতি। পরজগতে যন্ত্রণা তো চরম বেদনাদায়ক এবং চিরস্থায়ী।

মানুষকে যিনি সবচেয়ে ভালমত জানেন, তিনি হলেন মানুষের স্রষ্টা। প্রত্যেক যুগে, আল্লাহ সত্যধর্মের মাধ্যমে মানুষকে সব রকম ব্যাখ্যা এবং জ্ঞান দান করেছেন । আল্লাহ আমাদেরকে আল কুরআনে জানাচ্ছেন যে, মানুষ শ্রেষ্ঠ জীবনের দিশা পাবে যদি সে তাঁর পথ অনুসরণ করেঃ

“যারা সঠিক কর্ম করে, বিশ্বাসী পুরুষ বা নারী যে-ই হোক, তাকে আমি অবশ্যই এক পবিত্র উত্তম জীবন দান করব, তাদের কাজের জন্য আমি অবশ্যই তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করব।” (সূরা নাহলঃ ৯৭)

যাহোক, যদি তুচ্ছ লাভের আশায়, পার্থিব সুবিধা এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্খার অন্বেষায়, মানুষ আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, পরিণতিতে সে নিজেই বেদনাদায়ক দুর্ভোগের শিকার হবে। এর কারণ হল, আল কুরআনকে অবজ্ঞা করার অর্থ আল্লাহর দেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হওয়া। না কারো নিজের অভিজ্ঞতা, আর না পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহের সঞ্চিত জ্ঞান মানুষকে এই জগতে তার সঙ্কট মোকাবেলায় সাহায্য করবে । সঙ্কট, উদ্বেগ, মানসিক চাপ, বিড়ম্বনা এবং ব্যর্থতা তার জীবনকে ছেয়ে রাখবে। কিছুকাল পরে সেও আত্মসমর্পন করবে এই অবস্থার কাছে।

সে তার বর্তমান জীবন এই বিশ্বাসে ব্যয় করে ফেলবে যে, প্রতিকূল ঘটনা (যা আসলে বিশ্বাসহীনতার শাস্তি) হল জীবনের অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা।

যাহোক, সমাধান পরিস্কারঃ সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, এবং তাঁর অনুগ্রহস্বরূপ প্রদত্ত ধর্ম পালনের মাধ্যমে সত্যিকার সুখ এবং প্রশান্তি অর্জন করা। আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, এই জগতে মুক্তি হল ধর্মের পথে ফিরে আসা। তিনি আমাদেরকে এই সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর প্রতি নিবেদিত বান্দাহগণকে ভয় স্পর্শ করবে না যদি তারা তাঁর প্রতি অনুগত হয়।

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, জমিনে প্রতিনিধিত্ব তাদেরকে প্রদান করবেন, যেমন করেছেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তাদের দ্বীনকে তিনি সুদৃঢ় করবেনই যা তাদের জন্য মনোনীত করেছেন; এবং তাদের জন্য ভয়ের পরিবর্তে নিরাপত্তা বিধান করবেনই, । আমার দাসত্ব করবে, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না; এর পরও যারা অবিশ্বাস করবে, তারা বিপথগামী।" (সূরা নূরঃ ৫৫)

পরিশিষ্ট

ডারউইনবাদের পতন

এই পুস্তকে (যেখানে বিশ্বাসহীনতার দুঃস্বপ্ন আলোচিত হয়েছে) আমরা আলোচনা করেছি সেইসব সৌন্দর্য নিয়ে যা ধর্ম মানুষ ও সমাজকে উপহার দেয়। আমরা নিশ্চিত করেছি, সকল প্রকার অস্থিরতা এবং আপাত জটিল সমস্যাবলীর মূলোৎপাটন সম্ভব হবে ধর্মীয় মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে। আমরা এটিও প্রমান করেছি, শান্তির একমাত্র উপায় হল আল কুরআনের নৈতিক শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন। আমরা এটিও উল্লেখ করেছি, যেসব লোক আল্লাহ্‌র পথ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, তারা এই পৃথিবী এবং পরজীবনে বিরাট ক্ষতি এবং গ্লানির সম্মুখীন হবে।

আজকের দিনে অনেক লোক আছে যারা জীবনাচারে ধর্ম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে শুধু এই কারণে যে, এই অস্বীকৃতি তাদের নিজ অভিরুচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের বিশ্বাসহীনতা এবং উদ্ধত সাহসের কারণে সৃষ্ট অসচেতনতায় নিমজ্জিত থেকে তারা অন্য লোকদেরকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয় এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে অন্যদেরকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। এই লক্ষে তারা অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ ধারণা এবং বিকৃত মতাদর্শ আবিস্কার করেছে। এগুলোর মধ্যে একটা হল বিবর্তনবাদ।

ডারউইনবাদের লক্ষ্য হল মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে বাস্তবতা তা অস্বীকার করা; এই মতবাদ অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। এই মতবাদ, যার যুক্তি হল জড়বস্তু থেকে কাকতালীয়ভাবে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে, তা বিলুপ্ত হয়েছে এই স্বীকৃতির মাধ্যমে যে, এই মহাবিশ্ব আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ এই মহাজগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি এটির পরিকল্পনা করেছিলেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পর্যায় পর্যন্ত। অতএব, বিবর্তনবাদ তত্ত্বের জন্য সত্য হওয়া অসম্ভব যার বক্তব্য হল, আল্লাহ প্রাণের সৃষ্টি করেননি, বরং এটা হল আকস্মিকতার ফল।

বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, আমরা যখন বিবর্তনবাদের দিকে লক্ষ্য করি তখন দেখি, এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক আবিস্কার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রাণের যে নক্সা, তা অত্যন্ত জটিল এবং নজর কাড়ার মত। উদাহরণ স্বরূপ, জড় জগতে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই কত সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপরে পরমাণুগুলি ভিত্তিশীল! আবার জীবজগতে আমরা লক্ষ্য করি কত জটিল পরিকল্পনায় এই সব পরমাণু একত্র করা হয়েছে এবং এগুলির গঠন-পদ্ধতি এবং কাঠামো কত অসাধারণ, যেমন প্রোটিন, এনজাইম এবং কোষ– যেগুলি পরমাণু দ্বারা গঠিত।

প্রাণের এই অসাধারণ নক্সা বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে ডারউইনবাদকে বাতিল করে দিয়েছে। আমরা এই বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছি আমাদের অন্য কিছু গবেষণামূলক রচনায় এবং এটি অব্যাহত থাকবে। যাহোক, এটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা মনে করি, এখানে একটি সংক্ষিপ্তসার পেশ করা সহায়ক হবে।

যদিও মতবাদটির উৎপত্তি প্রাচীন গ্রিসে, তবু বিবর্তনবাদের ব্যাপ্তি ঘটে ১৯ শতকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উন্নয়ন, যা এই মতবাদকে বিজ্ঞানের জগতে সর্বাধিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করেছে তা হল, চার্লস ডারউইনের লেখা পুস্তক প্রজাতির উদ্ভব (দি অরিজিন অব স্পেসিজ)। এটা প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। এই পুস্তকে ডারউইন অস্বীকার করেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের জীবন্ত সব প্রজাতি আল্লাহ্ পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি করেছেন। ডারউইনের মতে, সকল প্রাণবান জীবের একটিই পূর্বপুরুষ ছিল। সময়ের পরিক্রমায় ছোট ছোট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা বৈচিত্রময় হয়ে ওঠে।

ডারউইনের মতবাদ কোন সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের উপরে ভিত্তিশীল ছিল না। তিনি নিজেও এটি স্বীকার করেছেন, এটা ছিল কেবলই "অনুমান"। তাছাড়া, 'মতবাদের (বিবর্তনবাদের) সমস্যাবলী' (ডিফিকাল্টিজ অব দ্যা থিওরি) নামক দীর্ঘ অধ্যায়ে ডারউইন স্বীকার করেছেন, অনেক সূক্ষ্ম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে এই মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে।

ডারউইন তাঁর সকল আশা বিনিয়োগ করেছেন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের মধ্যে; তিনি আশা করেছেন এগুলি (অর্থাৎ ভবিষ্যতের আবিস্কার) "মতবাদের সমস্যাবলী"র সমাধান করবে। তবে তাঁর প্রত্যাশার বিপরীতে, বৈজ্ঞানিক আবিস্কার এইসব সমস্যার পরিধি ও মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ডারউইনবাদের পরাজয় তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপরে পর্যালোচনা করা যেতে পারেঃ

এক. এই মতবাদ কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে না কিভাবে ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের উৎপত্তি ঘটল।

দুই. "বিবর্তনের পদ্ধতি (মেকানিজম)" – যা এই মতবাদ পেশ করে থাকে, তার ক্রমবিকাশ ঘটানোর ক্ষমতা আছে কি না, সে ব্যাপারে আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক আবিস্কার নেই।

তিন. জীবাশ্ম রেকর্ড বিবর্তনবাদের দেওয়া ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা প্রমাণ করে।

এই পর্যায়ে আমরা এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে সাধারণ রূপরেখায় পরীক্ষা করে দেখবঃ

প্রথম অনতিক্রম্য ধাপঃ প্রাণের উদ্ভব

বিবর্তনবাদ সত্য বলে গ্রহণ করেছে যে, সকল জীব-প্রজাতির ক্রমবিকাশ ঘটেছে একক জীবন্ত কোষ থেকে। সেই কোষের উদ্ভব ঘটেছিল ৩.৮ বিলিয়ন বছর আগেকার আদিম পৃথিবীতে। কিভাবে একটিমাত্র কোষ লক্ষ লক্ষ জীবিত প্রজাতির উৎপত্তি ঘটালো, আর সত্যিই যদি এই রকম বিবর্তন ঘটে থাকে, তাহলে জীবাশ্ম রেকর্ডে কেন তার কোন চিহ্ন নেই– এগুলি এমন কিছু প্রশ্ন যার উত্তর দিতে এই মতবাদ অক্ষম।

যাহোক, কথিত বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে যে প্রথম এবং প্রধান প্রশ্নের উদ্ভব হয়, তা হলঃ কিভাবে এই "প্রথম কোষ" এর উদ্ভব হল?

বিবর্তনবাদ যেহেতু পরিকল্পিত সৃষ্টিকে অস্বীকার করে এবং কোন প্রকার অতিপ্রাকৃতিক মধ্যস্থতাকে মেনে নেয় না, সেহেতু এটা দাবী করে যে, "আদিকোষ" এর উৎপত্তি ঘটেছিল প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কাকতালীয়ভাবে – কোন নক্সা, পরিকল্পনা বা আয়োজন ছিল না। এই মতবাদ অনুসারে, আকস্মিকভাবে জড়বস্তু থেকে একটি জীবন্ত কোষ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই দাবী জীববিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত সূত্র "জীবের উৎপত্তি জীব থেকে" -এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ডারউইন তাঁর পুস্তকে কখনো প্রাণের উৎপত্তির উল্লেখ করেননি। তাঁর সময়কালে বিজ্ঞানের পুরাতন জ্ঞান এই ধারণার উপরে ভিত্তিশীল ছিল যে, জীবের কাঠামো খুব সরল। মধ্যযুগ থেকেই আপনা থেকে উদ্ভব ঘটার মতবাদ এই ব্যাপারে জোর দিয়ে বলত যে, জড়বস্তুর কণা একত্র হয়ে জীব গঠন করে। এই মতবাদ ব্যাপভাবে স্বীকৃত ছিল। সাধারণভাবে বিশ্বস করা হত যে, পরিত্যক্ত খাবার থেকে কীটের উদ্ভব হয়, এবং গম থেকে ইঁদুরের উৎপত্তি হয়। এই মতবাদ প্রমান করার জন্য মজার সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হত। নোংরা কাপড়ের উপরে কিছু গম ফেলে রাখা হত; বিশ্বাস করা হত যে, কিছু সময় পরে এটা থেকে ইঁদুরের উৎপত্তি হবে।

অনুরূপভাবে, গোশ্তের মধ্যে দৃশ্যমান কীটকে আপনা থেকে উদ্ভবের প্রমান হিসাবে পেশ করা হত। তবে অল্প কিছুকাল পরে বুঝা গেল যে, গমের মধ্যে আপনাথেকেই কীটের সৃষ্টি হয় না, বরং এগুলো ছিল মাছির লার্ভা ; প্রথমে এগুলো খোলা চোখে দেখার অনুপযুক্ত ছিল।

এমনকি যে যুগে ডারউইন 'দি অরিজিন অব স্পেসিজ' রচনা করেন, তখনও বিজ্ঞানের জগতে এই ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, জড়বস্তু থেকে ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব ঘটতে পারে।

যাহোক, ডারউইনের পুস্তকটি প্রকাশিত হবার পাঁচ বছর পরে লুই পাস্তুর তাঁর দীর্ঘ গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। পাস্তুরের গবেষণা ডারউইনের মতবাদের ভিত্তি তথা আপনা-থেকে সৃষ্টিকে ভুল প্রমাণিত করে। ১৮৬৪ সালে পাস্তুর সর্বোন এ তাঁর সুবিখ্যাত বক্তৃতায় বলেন,"এই সরল পরীক্ষণ আপনা-থেকে উৎপত্তি মতবাদের উপরে মরণ আঘাত হেনেছে। সেই আঘাতের ক্ষত থেকে এই মতবাদ আর কখনোই সেরে উঠবে না।"[1]

বিবর্তনবাদের প্রবক্তারা দীর্ঘকাল পাস্তুরের আবিস্কার প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে জীবকোষের জটিল কাঠামো প্রকাশিত হওয়ায় কাকতালীয়ভাবে প্রাণের উদ্ভবের ধারণা আরো বেশি গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীতে নিষ্পত্তিহীন প্রয়াস

প্রথম যে বিবর্তনবাদী প্রাণের উদ্ভব নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে কাজ করেছেন, তিনি হলেন রাশিয়ার প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ওপারিন। ১৯৩০ এর দশকে তিনি বিভিন্ন থিসিস নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, আকস্মিকতার ফল স্বরূপ জীবকোষ গঠিত হতে পারে। তবে এইসব গবেষণার পরিণতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ওপারিনকে নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হয়: "দুর্ভাগ্যবশতঃ কোষের উৎপত্তি সম্পর্কিত সমস্যা হল জীবের বিবর্তন বিষয়ক গবেষণার সম্ভবতঃ সবচেয়ে দুর্বোধ্য বিষয়।"[2]

ওপারিনের বিবর্তনবাদী সমর্থকগণ চেষ্টা করে চললেন প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করতে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত পরীক্ষণটি পরিচালনা করেন আমেরিকান রসায়ণবিদ স্ট্যানলি মিলার ১৯৫৩ সালে। তাঁর দাবী অনুযায়ী আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যেসব গ্যাসীয় পদার্থ বিদ্যমান ছিল, সেগুলিকে তিনি পরীক্ষাগারে একত্র করেন। তারপর তাতে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের মাধ্যমে মিলার কিছু জৈব অণু

(এ্যামিনো এ্যাসিড) সংশেষণ করেন। এই এ্যাসিড প্রোটিনের গঠন-কাঠামোতে পাওয়া যায়।

মাত্র কয়েক বছর যেতে না যেতেই প্রকাশ পেল যে, এই পরীক্ষণ (যেটাকে তখন বিবর্তনবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছিল) ব্যর্থ হয়েছিল। পরীক্ষণে যে বায়ুমণ্ডল ব্যবহৃত হয়েছিল, তা ছিল পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা থেকে একেবারেই আলাদা।[3] দীর্ঘকাল পরে মিলার স্বীকার করেন যে, তাঁর ব্যবহৃত বায়ুমণ্ডল-মাধ্যম বাস্তবমূখী ছিল না।[4]

সমগ্র বিংশ শতাব্দীব্যাপী প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে বিবর্তনবাদীরা যত গবেষণা চালিয়েছেন, তার সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। স্যানডিয়েগো স্ক্রিপস ইন্সটিটিউটের জৈব-রসায়নবিদ জেফ্রি বাডা তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধে এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে 'আর্থ' সাময়িকীতে প্রকাশিত নিবন্ধে তিনি বলেন:

"আজ আমরা যখন বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করছি, তখনও আমরা সমাধান না হওয়া সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। সমস্যাটা তখনও ছিল যখন আমরা বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছিলাম। সেটা হল: ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল?"[5]

প্রাণের জটিল গঠন-কাঠামো

প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে এরকম বড় এক গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছে বিবর্তনবাদ। এই দিকভ্রান্তির প্রাথমিক কারণ হল, যে জীবটাকে নেহায়েত অতি সরল বলে মনে হয়, তার গঠন-কাঠামোও অবিশ্বাস্যরকম জটিল। মানুষের তৈরি যাবতীয় প্রযুক্তিগত পণ্যে চেয়ে একটি জীবন্ত কোষ অনেক বেশি জটিল। আজকের দিনে এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত গবেষণাগারেও জড়বস্তুসমূহ একত্র করেও একটি জীবন্ত কোষ তৈরি করা সম্ভব নয়।

একটি কোষ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি পরিমাণে এতই বিপুল যে, আকস্মিকতা দিয়ে তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কোষের গঠন-একক যে প্রেটিন, তা আকস্মিকভাবে গঠিত হবার সম্ভাবনা যদি ১ হয়, তাহলে না হবার সম্ভাবনা $১০^{৯৫০}$। (পাঠক লক্ষ্য করুন, ১ এর পরে মাত্র ১০টি শূণ্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা হল এক হাজার কোটি! তাহলে ৯৫০টি শূণ্য বসালে কত অকল্পনীয় বিপুল এক সংখ্যা পাওয়া যায়!– অনুবাদক) কারণ, একটি সাধারণ প্রোটিন গঠিত হয় ৫০০ এ্যামিনো এসিড দিয়ে। গণিতশাস্ত্রে $১০^{৫০}$ এর তুলনায় ১ এর কম সম্ভাবনাকে বাস্তবে অসম্ভব বিবেচনা করা হয়।

কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ডি,এন,এ অণু (যা বংশগত তথ্য সংরক্ষণ করে) এক অবিশ্বাস্য তথ্যভাণ্ডার। হিসাব করে দেখা গেছে, ডি, এন, এ তে যে তথ্য-সঙ্কেত রয়েছে তা যদি লিপিবদ্ধ করা হত, তবে তা হত এক বড় লাইব্রেরি; সেখানে থাকত ৯০০ খণ্ডের এক বিশ্বকোষ যার প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০০।

এই পর্যায়ে এসে খুব মজার এক উভয়সংকট সৃষ্টি হয়ঃ ডি, এন, এ প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে কেবল কিছু বিশেষ ধরণের প্রোটিনের (এনজাইম) সাহায্যে। এইসব এনজাইমের সংশ্লেষণ সম্ভব হতে পারে কেবল ডি,এন,এ তে রক্ষিত তথ্য-সংকেতের সাহায্যে। তারা উভয়ে (ডি,এন,এ এবং এনজাইম) যেহেতু পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল, সেহেতু প্রতিরূপ তৈরির জন্য তাদেরকে একই সময়ে বিদ্যমান থাকতে হবে। এটা থেকে আকস্মিকভাবে প্রাণের সৃষ্টি– এই দৃশ্যপট বাতিল হয়ে যায়। সানডিয়েগো ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান বিবর্তনবাদী অধ্যাপক লেসলি অরগেল এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছেন 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' নামক বিজ্ঞান সাময়িকীর সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ সংখ্যায়ঃ

"এটা খুবই অসম্ভব যে, প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক এসিড (উভয়েই কাঠামোগতভাবে জটিল) একই সময়ে একই স্থানে প্রস্তুত ছিল। একটা ছাড়া অন্যটা পাওয়াও অসম্ভব মনে হয়। আর এই জন্য, প্রথম দৃষ্টিতে একজনকে এই উপসংহারে পৌঁছাতে হতে পারে যে, প্রাণ আসলেই কখনো রাসায়নিক উপায়ে উৎপত্তিলাভ করেনি।"[6]

সন্দেহ নেই, প্রাকৃতিক কারণে প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব। তাহলে এটা মেনে নিতে হবে যে, প্রাণ "সৃষ্টি করা হয়েছিল" অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে। এই বাস্তবতা স্পষ্টতঃ বিবর্তনবাদকে বাতিল করে দেয়, যার মূল উদ্দেশ্য হল সৃষ্টিতত্ত্বকে অস্বীকার।

বিবর্তনবাদের কাল্পনিক ক্রিয়া-পদ্ধতি

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডারউইনের মতবাদকে নাকচ করে দেয় তা হল, "বিবর্তনের ক্রিয়া-পদ্ধতি" । এই পদ্ধতির নামে যে দু'টো ধারণা এই মতবার পেশ করে, বাস্তবে সেগুলোর ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা নেই।

ডারউইনের বিবর্তনের দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিশীল "প্রাকৃতিক নির্বাচন" নামক পদ্ধতির উপরে। তিনি এই পদ্ধতির উপরে যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা তাঁর পুস্তকের নাম থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়: 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি' (The Origin of Species by Means of Natural Selection)

প্রাকৃতিক নির্বাচনের বক্তব্য হল, যেসব জীব বেশি শক্তিশালী এবং তাদের বাসস্থানের প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে বেশি মানানসই, তারা জীবন-সংগ্রামে টিকে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, হিংস্র প্রাণির আক্রমণের ভয়ে তটস্থ একটি হরিণের পালে যারা বেশি দ্রুত দৌড়াতে পারবে, তারা টিকে থাকবে। অতএব, হরিণের পালে থাকবে বেশি গতিসম্পন্ন এবং বেশি শক্তিশালী হরিণ। তবে এই পদ্ধতি হরিণের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন ঘটাতে পারবে না– এটা সুনিশ্চিত। উদাহরণ স্বরূপ, এই পদ্ধতিতে হরিণ নিজিকে রূপান্তরিত করে ঘোড়ায় পরিণত হতে পারবে না।

অতএব, প্রাকৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতির বিবর্তন ঘটানো ক্ষমতা নেই। ডারউইন নিজেও এই বাস্তবতার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন; তাঁর পুস্তক 'দি অরিজিন অব স্পেসিজ' এ উল্লেখ করতে হয়েছে: "কোন একক জীবের মধ্যে অনুকূল পার্থক্য বা ভিন্নতা না ঘটা পর্যন্ত প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছুই করতে পারে না।"[7]

লামার্কের প্রভাব

তাহলে কিভাবে এই "অনুকূল ভিন্নতা" ঘটল? ডারউইন তার নিজের যুগের বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। ফরাসী জীববিজ্ঞানী লামার্ক ডারউইনের আগের যুগের মানুষ ছিলেন; তাঁর মতে, কোন জীব তার জীবনকালে যেসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, তা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বাহিত হওয়া এসব বৈশিষ্ট্য একত্র হয়ে নতুন প্রজাতি গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ, লামার্কের মতে, এন্টিলোপ বিবর্তিত হয়ে জিরাফ হয়েছে। তারা যখন উঁচু উঁচু গাছের পাতা খাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, তখন প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের তাদের গলা বড় হতে থেকেছে।

ডারউইনও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি তাঁর পুস্তক 'দি অরিজিন অব স্পেসিজ' এ লিখেছেন যে, কিছু ভল্লুক খাবারের সন্ধানে পানিতে নেমেছে এবং কালের পরিক্রমায় নিজেদেরকে পরিবর্তিত করে তিমি হয়ে গেছে।[৪]

যাহোক, মেণ্ডেলের আবিস্কৃত এবং বিংশ শতাব্দীতে বিকশিত বংশগতি বিজ্ঞানের (জেনেটিক্স) বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সূত্রাবলী অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হবার এই রূপকথাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়েছে। এভাবে, বিবর্তনের ক্রিয়া-পদ্ধতি হিসাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন বিজ্ঞানের সমর্থন হারিয়েছে।

নব্য ডারউইনবাদ ও মিউটেশন

সমাধান খুঁজে পাবার জন্য বিবর্তনবাদীরা ১৯৩০ এর দশকের শেষ দিকে এসে "আধুনিক সমন্বয়ী তত্ত্ব" গড়ে তোলেন; সাধারণভাবে এটাকে বলা হয় নব্য ডারউইনবাদ। এই নব্য ডারউইনবাদ যুক্ত করল পরিবর্তন বা মিউটেশন। এটা হল, তেজস্ক্রীয়তা বা প্রতিরূপ ত্রুটির মত বাহ্যিত কোন কারণে জীবকোষের জিন বিকৃত

হওয়া। এটাকে তাঁরা প্রাকৃতিক পরিবর্তন ছাড়াও "অনুকল বৈচিত্রের কারণ" বলে উল্লেখ করছেন।

আজ পৃথিবীতে বিবর্তনের যে নমুনা দাঁড় করানো হয়েছে, তা হল নব্য ডারউইনবাদ। এই মতবাদের বক্তব্য হলঃ পৃথিবীর বুকে এই যে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব গড়ে উঠেছে, এসব সম্ভব হয়েছে মিউটেশন বা জিনগত বিশৃঙ্খলার অধীন হবার ফলে। এই প্রক্রিয়াতেই তাদের অসংখ্য জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন, কান, চোখ, ফুসফুস, ডানা গড়ে উঠেছে। তবে একটি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে যা এই মতবাদের ভিত্তি টলিয়ে দেয়ঃ মিউটেশন তথা জিনের পরিবর্তন জীবের বিকাশ বা উন্নয়ন ঘটায় না, বরং তারা সব সময় জীবের ক্ষতি করে থাকে।

এর কারণ খুবই সহজ। ডি,এন,এ এর গঠন-কাঠামো খুবই জটিল, এর উপরে এলোপাথাড়ি প্রভাব কেবল ক্ষতিই করতে পারে। আমেরিকার বংশগতি বিজ্ঞানী বি,জি, রাঙ্গানাথান এটার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

"প্রথমতঃ সত্যিকারের মিউটেশন প্রকৃতিতে খুবই দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ মিউটেশন ক্ষতিকর। কারণ, জিনের কাঠামোতে এই পরিবর্তন সুশৃঙ্খল নয়, বরং এলোমেলো। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার এলোমেলো, লক্ষ্যহীন পরিবর্তন অবনতি ঘটাবে, উন্নতি নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ভূমিকম্প দালানের মত কোন অতি সুশৃঙ্খল কাঠামোতে ঝাঁকুনি দেয়, তাহলে দালানের কাঠামোতে এলোপাথাড়ি পরিবর্তন ঘটবে; সমূহ হম্ভাবনা রয়েছে যে, এতে কোন উন্নয়ন ঘটবে না।"[9]

অবাক হবার কিছু নেই, এমন কোন মিউটেশনের উদাহরণ পাওয়া যায়নি যা উপকারী , অর্থাৎ যা জিনগত সঙ্কেতের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। প্রাপ্ত সমস্ত মিউটেশনই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এটা বুঝতে পারা গেছে যে, মিউটেশন, যাকে "বিবর্তনমূলক পদ্ধতি" হিসাবে পেশ করা হয়, তা আসলে এক জিনগত ঘটনা যা জীবের ক্ষতি করে থাকে এবং তাদেরকে বিকলাঙ্গ করে দেয়। (মানুষের উপরে মিউটেশনের সবচেয়ে

সাধারণ প্রভাব হল ক্যান্সার) সন্দেহ নেই, ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি "বিবর্তন বা বিকাশমূলক পদ্ধতি" হতে পারে না পক্ষান্তরে, প্রাকৃতিক নির্বাচন "নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না" যা ডারউইন নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন। এই বাস্তবতা আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, প্রকৃতিতে কোন "বিবর্তনমূলক পদ্ধতি" নেই। যেহেতু কোন বিবর্তনমূলক পদ্ধতির অস্তিত্ব নেই, সেহেতু বিবর্তন নামক কোন কাল্পনিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়নি।

জীবাশ্ম রেকর্ডঃ মধ্যবর্তী পর্যায়ের জীবের কোন চিহ্ন নেই

বিবর্তনবাদ যে দৃশ্যপটের ধারণা দেয়, তা যে ঘটেনি; তার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ হল জীবাশ্ম রেকর্ড।

বিবর্তনবাদের মতে, প্রতিটি জীবের প্রজাতি আবির্ভূত হয়েছে একই পূর্বপুরুষ থেকে। আগে থেকে বিদ্যমান একটি প্রজাতি কালে অন্যকিছুতে পরিণত হয়েছে; সকল প্রজাতি একইভাবে অস্তিত্বলাভ করেছে। এই মতবাদ অনুসারে, রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে।

এটাই যদি ঘটে থাকত, তাহলে অসংখ্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের জীবের অস্তিত্ব থাকার কথা ছিল এবং এই দীর্ঘ রূপান্তরের কালে তাদের জীবিত থাকার কথা ছিল।

উদাহরণ স্বরূপ, অতীতকালে কিছু আধা-মাছ, আধা-সরীসৃপ জাতীয় প্রাণি থাকার কথা ছিল। এদের আগে থেকে বিদ্যমান নিজস্ব মাছের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সরীসৃপের কিছু অর্জিত বৈশিষ্ট্যও থাকার কথা ছিল। কিংবা কিছু সরীসৃপ-পাখির অস্তিত্ব থাকা উচিত ছিল, যারা আগে থেকে বিদ্যমান সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যর সাথে পাখির কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। এগুলি যেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন দশা, সেহেতু তাদের হওয়া উচিত ছিল প্রতিবন্ধী, ত্রুটিযুক্ত এবং বিকলাঙ্গ জীব। বিবর্তনবাদীরা এইসব কাল্পনিক "মধ্যবর্তী দেহকাঠামোধারী" জীবের উল্লেখ করে থাকেন; তারা বিশ্বাস করেন যে, অতীতে এদের অস্তিত্ব ছিল।

যদি এই রকম প্রাণির অস্তিত্ব সত্যিই থাকত, তাহলে তাদের সংখ্যা এবং বৈচিত্র হত লক্ষ লক্ষ, বরং কোটি কোটি। আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, এইসব অদ্ভুত জীবের দেহাবশেষ জীবাশ্ম রেকর্ডে থাকত। 'দি অরিজিন অব স্পেসিজ' গ্রন্থে ডারউইন ব্যাখ্যা করছেনঃ

"আমার মতবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে অসংখ্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের বিভিন্ন প্রকার জীব, যারা একই দলের সকল প্রজাতিকে খুব ঘনিষ্টভাবে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেছিল– এরকম কিছুর অবশ্যই অস্তিত্ব ছিল . . . ফলে তাদের অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যেতে পারে তাদের দেহের অবশিষ্ট হিসাবে জীবাশ্মের মধ্যে।"[10]

ডারউইনের আশাভঙ্গ

বিবর্তনবাদীরা যদিও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তামাম পৃথিবী জুড়ে জীবাশ্মের সন্ধানে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, তবুও মধ্যবর্তী দেহ-কাঠামোর কোন জীবাশ্ম এখনো বেরিয়ে আসেনি। খননের ফলে যেসব জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছে, তা বরং বিবর্তনবাদীদের প্রত্যাশার বিপরীত ধারণা প্রদান করছেঃ ভূ-পৃষ্ঠে জীবের উদ্ভব হয়েছে আকস্মিকভাবে এবং সম্পূর্ণ সুগঠিত আকারে। একজন বিখ্যাত ইংরেজ জীবাশ্ম-বিজ্ঞানী ডেরেক, ভি, এগার নিজে বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও এই বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েছেনঃ

"এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে যে, আমরা যদি জীবাশ্ম রেকর্ড সবিস্তারে পরীক্ষা করি, সেটা বর্গ পর্যায়ের হোক বা প্রজাতি পর্যায়ের, আমরা বারবার দেখতে পাই, ক্রমবিকাশ লাভ বা বিবর্তন নয়, বরং আকস্মিক বিস্ফোরণের মত এক দলের বিলুপ্তিতে অন্য দলের উদ্ভব হয়েছে।"[11]

এটার অর্থ হল, জীবাশ্ম রেকর্ডে সকল জীবিত প্রজাতি আকস্মিকভাবে পূর্ণ সুগঠিত আকারে আবির্ভুত হয়েছে কোন মধ্যবর্তী দেহ-কাঠামো ছাড়াই। এটি ডারউইনের

অনুমানের ঠিক বিপরীত। তাছাড়া, এটি খুবই জোরালো প্রমান যে, জীবকূলকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি জীব-প্রজাতি কোন বিবর্তনমূলক পূর্বপুরুষ ছাড়া হঠাৎকরে সম্পূর্ণ নিখুঁত পরিপূর্ণতা সহকারে আবির্ভুত হবার একটিই ব্যাখ্যা হতে পারে তা হল, এই প্রজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন সুপরিচিত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী ডগলাস ফিউটুইমাঃ

"সৃষ্টিতত্ব এবং বিবর্তন জীবের উৎপত্তির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা করে। ভূ-পৃষ্ঠে জীবের উদ্ভব ঘটেছে সম্পূর্ণ সুগঠিত কাঠামোয়, না কি তেমনটি হয়নি? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে তারা নিশ্চয় বিকাশলাভ করেছে পূর্ব থেকে অস্তিত্বমান কোন প্রজাতি থেকে রূপান্তরের কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে । যদি তারা সম্পূর্ণ সুগঠিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে নিশ্চয় তাদেরকে কোন সর্বশক্তিমান, বুদ্ধিমান সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন।"[12]

জীবাশ্ম থেকে দেখা যায়, ভুপৃষ্ঠে জীবের উদ্ভব ঘটেছে পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় নিখুঁত কাঠামো সহকারে। এটার অর্থ হল, "প্রজাতির উৎপত্তি" ডারউইনের ধারণার বিপরীতঃ ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন নয়, বরং পরিকল্পিত সৃষ্টি।

মানব বিবর্তনের কাহিনি

বিবর্তনবাদের প্রবক্তাগণ অধিকাংশ সময় মানুষের উৎপত্তির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেন। ডারউইনের দাবী হল, আজকের আধুনিক মানুষ বির্তিত হয়েছে বানর জাতীয় প্রাণি থেকে। দাবীকৃত এই বিবর্তন প্রক্রিয়া ৪-৫ মিলিয়ন বছর আগে শুরু হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। বলা হয়, আধুনিক মানুষ ও তার পূর্বপুরুষের মাঝে কিছু "মধ্যবর্তী পর্যায়" এর প্রাণি ছিল। সম্পূর্ণ কাল্পনিক এই দৃশ্যপটের মতে, চারটি মৌলিক "শ্রেণি" তালিকাভূক্ত হয়ঃ

১.অস্ট্রালোপিথেকাস
২.হোমো হ্যাবিলিস
৩.হোমো ইরেকটাস
৪.হোমো স্যাপিয়েন্স

বিবতর্দনবাদীরা মানুষের তথাকথিত প্রথম বানর-সদৃশ পূর্বপুরুষকে 'অস্ট্রালোপিথেকাস' বলে; এটার অর্থ হল, 'দক্ষিণ আফ্রিকার বানর'। এই প্রাণিগুলি আসলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একটি প্রাচীন বানর প্রজাতি ছাড়া কিছুই নয়। ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের দুইজন বিশ্ববিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ বিভিন্ন অস্ট্রালোপিথেকাস নমুনা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এঁরা হলেন লর্ড মোলি জাকারম্যান এবং প্রফেসর চার্লস অক্সনার্ড। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, অস্ট্রালোপিথেকাস সাধারণ বানর শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত ছিল; এরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের সাথে এদের কোন সাদৃশ্য নেই।[13]

বিবর্তনবাদীরা মানব-বিবর্তনের পরবর্তী ধাপকে 'হোমো' অর্থাৎ মানুষ বলে শ্রেণিভাগ করেছেন। বিবর্তনবাদের দাবী অনুসারে, হোমো সিরিজের প্রাণিগুলো অস্ট্রালোপিথেকাসের চেয়ে বেশি উন্নত। বিবর্তনবাদীরা একটা কাল্পনিক ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র উদ্ভাবন করেছেন এইসব প্রাণির বিভিন্ন জীবাশ্ম একটি বিশেষ শৃঙ্খলায় সাজিয়ে। এই ক্রমবিন্যাস কাল্পনিক। কারণ, এটা কখনো প্রমাণিত হয়নি যে, এই শ্রেণিগুলির মধ্যে বিবর্তনমূলক সম্পর্ক রয়েছে। আর্নস্ট মায়ার, যিনি বিশ শতকে বিবর্তনবাদের অন্যতম প্রবক্তা, তাঁর পুস্তক 'ওয়ান লং আর্গুমেন্ট' এ উল্লেখ করেছেন, "বিশেষ করে, ঐতিহাসিক (ধাধা) যেমন প্রাণের উৎপত্তি বা মানুষের উদ্ভব– এগুলো খুবই জটিল এবং চূড়ান্ত, সন্তোষজনক ব্যাখ্যাকেও রুখে দিতে পারে।"[14]

"অস্ট্রালোপিথেকাস > হোমো হ্যাবিলিস > হোমো ইরেকটাস > হোমো স্যাপিয়েন্স" – এই সংযোগ শৃঙ্খলকে রেখাচিত্র করার মাধ্যমে বিবর্তনবাদীরা ইঙ্গিত দেন যে, এইসব প্রজাতি একটা অন্যটার পূর্বপুরুষ। তবে, জীবাশ্ম-নৃতত্ত্বের সাম্প্রতিক আবিস্কার প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, অস্ট্রালোপিথেকাস, হোমো হ্যাবিলিস এবং হোমো ইরেকটাস একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বাস করত।[15]

তাছাড়া, মানুষের একটা বিশেষ অংশ, যাদেরকে হোমো ইরেকটাস শ্রেণিভূক্ত করা হয়েছে, তারা আধুনিক যুগের ঠিক আগেও জীবিত ছিল। হোমো স্যাপিয়েন্স

নিয়ানডারথালেনসিস এবং হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স (আধুনিক মানুষ) একই অঞ্চলে একই সময়ে বিদ্যমান ছিল।[16]

এই বাস্তবতা স্পষ্টতঃ এই দাবীকে বাতিল করে দেয় যে, তারা একে অন্যের পূর্বপুরুষ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্ম বিশারদ স্টিফেন জাই গৌল্ড বিবর্তনবাদের এই অচলাবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন, যদিও তিনি নিজে একজন বিবর্তনবাদীঃ

"আমাদের মই-এর (জীবের ক্রমউন্নয়ণের চিত্র- অনুবাদক) কি হবে, যদি হোমিনিডের তিনটি পূর্বসূরী একই সময়ে বিদ্যমান থাকে (ক. আফ্রিকানুস, বিশাল অস্ট্রালোপিথেকাইনরা এবং হোমো হ্যাবিলিসরা)– এদের কেউ অন্যদের থেকে আসেনি? তাছাড়া, এই তিনটার কোনটাই পৃথিবীর বুকে তাদের অবস্থানকালে কোন বিবর্তনমূলক প্রবণতা দেখায়নি।"[17]

লর্ড সলি জাকারম্যান যিনি যুক্তরাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত এবং সম্মানিত বিজ্ঞানী এবং যিনি বহু বছর যাবৎ এই বিষয়ের উপরে গবেষণা চালিয়েছেন এবং বিশেষভাবে ১৫ বছরব্যাপী অস্ট্রালোপিথেকাসের জীবাশ্ম নিয়ে গবেষণা করছেন, তিনি নিজে বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও পরিশেষে উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, আসলে বানর-সদৃশ প্রাণি থেকে মানুষ– এই রকম কোন বংশলতিকা নেই।

জাকারম্যান বিভিন্ন বিজ্ঞানের এক মজার বর্ণালীও তৈরি করেছেন। এটা শুরু হয়েছে সেই সব বিষয় নিয়ে, যা তাঁর বিবেচনায় বৈজ্ঞানিক, আবার শেষে সেই সবও রয়েছে, যেগুলোকে তিনি অবৈজ্ঞানিক বিবেচনা করেছেন। জাকারম্যানের বর্ণালী অনুসারে, সবচেয়ে "বৈজ্ঞানিক" অর্থাৎ বাস্তব বৈজ্ঞানিক তথ্য-নির্ভর হল পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন। এর পরে আসে জীববিজ্ঞান এবং তারপরে সামাজিক বিজ্ঞান। বর্ণালীর একেবারে শেষপ্রান্তে, যে অংশকে সবচেয়ে "অবৈজ্ঞানিক" বিবেচনা করা হয়, সেগুলো হল "ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি"– এমন সব ধারণা যেমন টেলিপ্যাথি, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং পরিশেষে "মানব বিবর্তন"। জাকারম্যান তাঁর এই যুক্তিধারাকে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

"তারপর আমরা বস্তুনিষ্ঠ সত্যের নিবন্ধন থেকে সরে ধারণাগত জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি, যেমন ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি কিংবা মানুষের জীবাশ্ম ইতিহাসের ব্যাখ্যা যেখানে বিশ্বাসীদের (বিবর্তনবাদী) কাছে সবকিছুই সম্ভব– যেখানে (বিবর্তনবাদে) অত্যুৎসাহী বিশ্বাসী কখনো কখনো একই সময়ে কয়েক রকম পরস্পরবিরোধী বিষয় বিশ্বাস করতে পারে।"[18]

মানব-বিবর্তনের রূপকথা কিছু জীবাশ্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়, যেগুলো এই মতবাদের অন্ধ অনুসারীগণ আবিস্কার করেছিলেন।

চোখ ও কানের প্রযুক্তি

বিবর্তনবাদ অন্য আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দেয় না, সেটি হলঃ চোখ ও কানের অনন্যসাধারণ অনুভব ক্ষমতা।

চোখের বিষয়ে যাবার আগে 'আমরা কিভাবে দেখি' এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া যাক। কোন বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি চোখের রেটিনায় উল্টোভাবে পড়ে। এখানে কোষ আলোকরশ্মিকে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত করে। তারপর তা মস্তিষ্কের পিছন দিকে একটি ক্ষুদ্র স্থানে পৌঁছায় যাকে বলে দর্শন-কেন্দ্র। এই কেন্দ্র ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সংকেতকে ছবি আকারে উপলব্ধি করে থাকে। এই প্রকৌশলগত পটভূমিতে আসুন আমরা একটু চিন্তা করি।

মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ আলোহীন। এর অর্থ হল, মস্তিষ্কের মাঝখানটা সম্পূর্ণ অন্ধকার; যেখানে মস্তিষ্ক রয়েছে, সেখানে আলো পৌঁছায় না। যে স্থানকে দৃষ্টিকেন্দ্র বলা হয়, সেটা সম্পূর্ণ অন্ধকার স্থান, যেখানে কোন আলো কখনো পৌঁছায় না; হয়ত এটা আপনার জ্ঞাত অন্ধকার স্থানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার। অথচ এই প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই আপনি আলোকিত উজ্জ্বল জগত দেখে থাকেন।

চোখে গড়ে ওঠা এই প্রতিবিম্ব এতই স্পষ্ট যে, এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিও এটি আয়ত্ব করতে পারেনি। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যে বইটি পড়ছেন সেদিকে তাকান, যে হাত দিয়ে এটি ধরে আছেন সেদিকে দেখুন, তারপর মাথা তুলে চারিদিকে তাকান। অন্য কোথাও কি এত স্পষ্ট চিত্র দেখেছেন? এমনকি সবচেয়ে বড় টেলিভিশন নির্মাতাদের তৈরি সবচেয়ে উন্নত টেলিভিশন পর্দাও আপনার জন্য এই রকম স্পষ্ট ছবি তৈরি করতে পারবে না। এটি হল, ত্রিমাত্রিক, রঙিন এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ছবি। একশ' বছরেরও বেশি সময় যাবৎ হাজারো প্রকৌশলী চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই স্পষ্টতা অর্জনের জন্য। এই লক্ষ্যে অনেক বিশাল পরিসরের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অনেক গবেষণা, পরিকল্পনা এবং নক্সা প্রণয়ন করা হয়েছে। আবারো টেলিভিশন পর্দার দিকে এবং আপনার হাতের বইটির দিকে তাকান। আপনি স্পষ্টতার ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন। তাছাড়া, টেলিভিশন পর্দা আপনাকে দ্বিমাত্রিক ছবি প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে, চোখ দিয়ে আপনি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতাসহ ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে পান।

অনেক বছরব্যাপী হাজার হাজার প্রকৌশলী ত্রিমাত্রিক টেলিভিশন তৈরি এবং চোখে দেখা প্রতিচ্ছবির সমগুণসম্পন্ন ছবি তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। হ্যাঁ, তারা ত্রিমাত্রিক টেলিভিশন তৈরি করেছেন, কিন্তু বিশেষ ধরণের চশমা ছাড়া এটা দেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া, এটা কেবল কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক চিত্র। পটভূমি তুলনামূলকভাবে ঝাপসা, পুরোভূমি মনে হয় কাগজের সেটিং এর মত। চোখের মত স্পষ্ট দৃশ্য তৈরি করা কখনোই সম্ভব হয়নি। ক্যামেরা এবং টেলিভিশন উভয় ক্ষেত্রেই ছবির মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিবর্তনবাদীরা দাবী করেন, যে যন্ত্র-কৌশল এই সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তৈরি করে, তা আকস্মিকভাবে গঠিত হয়েছে। এখন, কেউ যদি আপনাকে বলে যে, আপনার ঘরের টেলিভিশনটা (যেটা ছবি দেখিয়ে থাকে) আকস্মিকভাবে তৈরি হয়েছে, এর সব অণু-পরমাণু দৈবক্রমে একত্র হয়ে ছবি তৈরি করা এই যন্ত্রটি গড়ে উঠেছে, তাহলে আপনি কি ভাববেন? হাজারো মানুষ (প্রকৌশলী পর্যায়ের মানুষ – অনুবাদক) যা পারে না, তা পরমাণু কিভাবে পারে?

যদি চোখের চেয়ে নিম্নমানের ছবি প্রস্তুতকারী যন্ত্র আকস্মিকতার ফলে গঠিত হতে না পারে, তাহলে এটি খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চোখ এবং চোখে তৈরি হওয়া ছবি দৈবক্রমে গড়ে উঠতে পারে না। একই অবস্থা কানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বহিঃকর্ণ প্রাপ্ত শব্দকে গ্রহন করে এবং তা মধ্যকর্ণের দিকে প্রেরণ করে; মধ্যকর্ণ শব্দের কম্পনকে বৃদ্ধি করে অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে; অন্তঃকর্ণ এই কম্পনকে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। চোখের মতই, শ্রবনের কাজ চূড়ান্ত হয় মস্তিষ্কের শ্রবন-কেন্দ্রে।

চোখের অবস্থা কানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ মস্তিষ্ক যেমন আলোকরোধী, তেমনি শব্দ নিরোধকও বটে। এটা কোন শব্দকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না। ফলে বাইরে কত হট্টগোল, তাতে কিছু এসে যায় না; মস্তিষ্কের মধ্যস্থল সম্পূর্ণ নীরব। তথাপি খুব সূক্ষ্ম শব্দও মস্তিষ্কে ধরা পড়ে। আপনার যে মস্তিষ্ক শব্দরোধী, তাতেই আপনি অর্কেস্ট্রার ঐকতান শোনেন, জনাকীর্ণ স্থানের হট্টগোল শোনেন। অথচ, আপনার মস্তিষ্কে সেই মুহূর্তের শব্দের মাত্রা পরিমাপ করলে দেখা যাবে, সেখানে পূর্ণ নিরবতা বিরাজ করছে।

ছবির ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছে, যুগ যুগ ধরে চেষ্টা চালানো হয়েছে প্রকৃত ধ্বনির অনুরূপ ধ্বনি উৎপন্ন করার জন্য। এই প্রচেষ্টার ফল হল শব্দধারণ যন্ত্র, হাইফাই (হাই ফিডেলিটি) যন্ত্র এবং শব্দ বুঝতে পারার যন্ত্র। এতসব প্রযুক্তি এবং হাজারো প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কানে যে শব্দ আসে, তার মত নিখুঁত এবং স্পষ্ট শব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সঙ্গীত শিল্পের সবচেয়ে নামী কারখানায় তৈরি সবচেয়ে উন্নতমানের হাই-ফাই সিস্টেমের কথা ভাবুন। এমনকি এইসব যন্ত্রেও যখন শব্দ ধারণ করা হয়, তখন এর কিছুটা হারিয়ে যায়। কিংবা আপনি যখন হাই-ফাই চালু করেন, তখন সঙ্গীতের সুর আরম্ভ হবার আগে হিস হিস শব্দ সব সময় শোনা যায়। যাহোক, মানবদেহের প্রযুক্তি যে শব্দ ধারণ করে, তা খুব সূক্ষ্ম এবং পরিস্কার। মানব-কর্ণ কোন শব্দের সাথে সাথে হিস হিস শব্দ বা পারিপার্শ্বিক শব্দ শোনে না, যেমনটি ঘটে হাই-ফাই এর ক্ষেত্রে। শব্দ ঠিক যেমন, কর্ণ ঠিক তেমনটিই ধারণ করে– সূক্ষ্ম এবং পরিস্কার। মানব-সৃষ্টির সূচনা থেকে এভাবেই হয়ে আসছে।

এযাবৎ এমন কোন দেখার বা শব্দ ধারণ করার যন্ত্র মানুষ তৈরি করেনি, যা চোখ ও কানের মত তথ্য ধারণে এত সফল এবং সংবেদনশীল। যাহোক, দেখা ও শোনার সম্পৃক্ততা যতটা রয়েছে, এর আড়ালে রয়েছে আরো অনেক বড় বাস্তবতা।

যে চেতনা মস্তিষ্কের মধ্যে দেখায় ও শোনায়, সেটি কার?

সে কে, যে তার মস্তিষ্কের মধ্যে এক মনোমুগ্ধকর জগৎ দেখে, সুরের ঐকতান শোনে, পাখির কলতান শোনে এবং গোলাপের ঘ্রাণ নেয়?

যে উদ্দীপনা মানুষের চোখ, কান এবং নাক থেকে আসে, তা বিদ্যুৎ-রাসায়নিক স্নায়ু-তাড়না হিসাবে মস্তিষ্কের পথে চলে। কিভাবে মস্তিষ্কে এই ছবি গঠিত হয় সে ব্যাপারে জীববিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব এবং জৈব-রসায়নের পুস্তকাদিতে আপনি অনেক বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। তবে আপনি কখনোই এই বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার সম্মুখীন হবেন নাঃ সে কে যে এই বিদ্যুৎ-রাসায়নিক স্নায়ু তাড়নাকে ছবি, শব্দ, গন্ধ এবং ইন্দ্রিয়গত ঘটনা হিসাবে অনুভব করে? মস্তিষ্কে এক চেতনা থাকে, যা এই সবকিছু অনুভব করে চোখ, কান ও নাকের প্রয়োজন বোধ না করেই। এই চেতনা কার অধিকারে রয়েছে? কোন সন্দেহ নেই, এই চেতনা স্নায়ুর মালিকানায় নেই– মস্তিষ্ক গঠনকারী চর্বির স্তর বা নিউরনের মালিকানায় নেই। এই কারণেই ডারউইনপন্থী বস্তুবাদীরা (যারা বিশ্বাস করে যে, সবকিছুই বস্তু দিয়ে গঠিত) এইসব প্রশ্নে কোন উত্তর দিতে পারেন না।

কারণ, এই সচেতনতা হল আল্লাহ্‌র সৃষ্ট চেতনা। দেখার জন্য এই চেতনার চোখ প্রয়োজন পড়ে না, শোনার জন্য প্রয়োজন পড়ে না কানের। তাছাড়া, চিন্তা করার জন্য এর মস্তিষ্ক প্রয়োজন নেই।

প্রত্যেকেরই (যারা এই স্পষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়টি পড়ছেন) উচিত সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করা, তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

করা যিনি এই সমগ্র মহাবিশ্বকে সঙ্কুচিত করে কয়েক ঘনসেণ্টিমিটারের প্রগাঢ় কালো স্থানে সীমিত করেছেন ত্রিমাত্রিক, ছায়াময় এবং আলোকজ্জ্বল আকারে।

একটা বস্তুবাদী বিশ্বাস

এযাবৎ আমরা যে তথ্য প্রদান করলাম, তা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিবর্তনবাদ হল এমন এক দাবী যা স্পষ্টতঃ বৈজ্ঞানিক আবিস্কার থেকে ভিন্ন। প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতবাদের দাবী গ্রহনযোগ্য নয়; বিবর্তন ঘটানোর জন্য যেসব পদ্ধতির কথা এই মতবাদ বলে, তার ক্রমবিকাশ ঘটানোর কোন ক্ষমতা নেই, এবং জীবাশ্ম থেকে দেখা যায় যে, এই মতবাদের জন্য যে মধ্যবর্তী পর্যায়ের প্রাণি প্রয়োজন, তার কখনো কোন অস্তিত্ব ছিল না। অতএব, পরবর্তী পদক্ষেপ এটাই হওয়া উচিত যে, বিবর্তনবাদকে অবৈজ্ঞানিক ধারণা হিসাবে এক পাশে সরিয়ে রাখতে হবে। এভাবেই অনেক ধারণা, যেমন পৃথিবী-কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা, বিজ্ঞানের আলোচ্যসূচি থেকে বাদ পড়েছে।

তবে বিবর্তনবাদ জোর করেই বিজ্ঞানের আলোচ্যসূচিতে রয়ে গেছে। এমনকি কিছু লোক এই মতবাদের সমালোচনাকে 'বিজ্ঞানের উপরে আক্রমণ' হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেন। কেন?

কারণ হল এই যে, কিছু মহলের কাছে বিবর্তনবাদ হল এক অপরিহার্য যুক্তিহীন বিশ্বাস। এই মহল বস্তুবাদী দর্শনের অন্ধভক্ত। তারা ডারউইনবাদকে অবলম্বন হিসাবে নেয়, কারণ এটা হল প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের একমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা।

খুব মজার ব্যাপার হল, তারা কখনো কখনো এটার স্বীকারোক্তিও দিয়ে থাকে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুপরিচিত বংশগতিবিদ এবং স্পষ্টভাষী বিবর্তনবাদী রিচার্ড সি, লিওনটিন স্বীকার করে নেন যে, তিনি "প্রথমতঃ এবং প্রধানত বস্তুবাদী, তার পরে বিজ্ঞানী":

"বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং ভিত্তি আমাদেরকে যেকোনভাবে পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহন করতে বাধ্য করে– এমনটি নয়। বরং আমরা বাধ্য হই বস্তুগত কারণের প্রতি আমাদের আগে থেকে আসক্তির জন্য। এটা আমরা করি তদন্তের একটা পদ্ধতি তৈরির জন্য এবং বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করে এরকম এক সেট ধারণা গঠনের জন্য। সেই ব্যাখ্যা যতই আমাদের স্বজ্ঞার বিপরীত হোক, অপ্রবর্তিত এর প্রতি রহস্যপূর্ণ হোক। তাছাড়া, এই বস্তুবাদ হল শর্তহীন; কাজেই আমরা এর দুয়ারে কোন ঐশী পদচিহ্ন মেনে নিতে পারি না।"[19]

এই বিবৃতি স্পষ্ট করে দেয় যে, ডারউইনবাদ হল এক অন্ধবিশ্বাস যা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আনুগত্যের খাতিরে। এই গোঁড়া বিশ্বাসের দাবী হলঃ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই। অতএব, এটা যুক্তি দেয়ঃ প্রাণহীন, অচেতন বস্তু প্রাণের সৃষ্টি করেছে। এই মতবাদে জোর দিয়ে বলা হয় যে, লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব, উদাহরণ স্বরূপ, পাখি, মাছ, জিরাফ, বাঘ, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, ফুল, তিমি, মানুষ অস্তিত্ব পেয়েছে জড়বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়ার (যেমন বৃষ্টিধারা, বজ্রপাত ইত্যাদি) ফলে।

তথ্যসূত্র

1- Sidney Fox, Klaus Dose, *Molecular Evolution and The Origin of Life*, W.H. Freeman and Company, San Francisco, 1972, p. 4.

2- Alexander I. Oparin, *Origin of Life*, Dover Publications, NewYork, 1936, 1953 (reprint), p. 196.

3- "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol 63, November 1982, p. 1328-1330.

4- Stanley Miller, *Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules*, 1986, p. 7.

5- Jeffrey Bada, *Earth*, February 1998, p. 40

6- Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", *Scientific American*, vol. 271, October 1994, p. 78.

7- Charles Darwin, *The Origin of Species by Means of Natural Selection*, The Modern Library, New York, p. 127.

8- Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 184.

9- B. G. Ranganathan, *Origins?*, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.

10- Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 179.

11- Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", *Proceedings of the British Geological Association*, vol 87, 1976, p. 133.

12- Douglas J. Futuyma, *Science on Trial*, Pantheon Books, New York, 1983. p. 197.

13- Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*, Toplinger Publications, New York, 1970, pp. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", *Nature*, vol 258, p. 389.

14- "Could science be brought to an end by scientists' belief that they have final answers or by society's reluctance to pay the bills?" *Scientific American*, December 1992, p. 20.

15- Alan Walker, *Science*, vol. 207, 7 March 1980, p. 1103; A. J. Kelso, *Physical Antropology*, 1st ed., J. B. Lipincott Co., New York, 1970, p. 221; M. D. Leakey, *Olduvai Gorge*, vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, p. 272.

16- Jeffrey Kluger, "Not So Extinct After All: The Primitive Homo Erectus May Have Survived Long Enough To Coexist With Modern Humans," *Time*, 23 December 1996.

17- S. J. Gould, *Natural History*, vol. 85, 1976, p. 30.

18- Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*, p. 19.

19- Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World," *The New York Review of Books*, January 9, 1997, p. 28.